শিশু সাথী

ভাদ্র

১৩৭৩

দেবজ্যোতি
ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবংগের অগ্রগতি

পশ্চিমবংগের বিভিন্ন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান তিনটী পরিকল্পনাতেই একটী বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ব্যাপকতর কর্ম প্রচেষ্টা চলেছে। জাতীয় শক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি যে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে একথা মনে রেখেই বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত—এবং সেগুলি রূপায়িত করা হয়েছে বা হচ্ছে।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান

(হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্‌পেন্‌সারী, ক্লিনিক প্রভৃতি)

	১৯৪৮		১৯৬৫	
	সংখ্যা	শয্যা	সংখ্যা	শয্যা
গ্রামাঞ্চলে	৮৯৯	৬০৯৭	১৪৫৭	১২,০০৪
শহরাঞ্চলে	৩০২	১১,৪৫২	৫০৯	২১,১০০

শিক্ষায়তনসমূহে চিকিৎসা ব্যবস্থা

	১৯৫৫	১৯৬৫
স্কুল হেল্‌থ্ ক্লিনিকের সংখ্যা	২২৪	৫৭০
বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষিত ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা	৮৬,২৯৫	৩,৮১,৬৪১

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়

১৯৬৪-৬৫—১৭,৪৮,৬৪,০০০ টাকা ১৯৬৫-৬৬—১৯,০৫,৭৯,০০০ টাকা

মাথাপিছু ব্যয়

১৯৬৪-৬৫ সালে — ৪·৯৩ টাকা

জনস্বাস্থ্যের কল্যাণের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে—

মৃত্যুর হার শতকরা ৬০ ভাগ কমেছে (১৯৪৮-৬৫)

আয়ুষ্কাল জনপ্রতি—২৩·২৭ বছর বেড়েছে (১৯৩১-৬০)

শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে—

পশ্চিমবাংলা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

W. B. (I. & P. R.) AD./4691/66.

জম্মুতে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের একটি যৌথ খামার।

যৌথ খামারের কর্মীবৃন্দ সকাল সাতটায় কাজে যোগ দিতে চলেছেন।

শিশু সাথী
প্রথম
প্রকাশ
১৩২৯

৪৫শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৭৩ | ৫ম সংখ্যা

একটা কিছু কর

॥ বেণু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

ওরে স্বাধীন দেশের ছেলে,
তোরা একটা কিছু কর।
দেশের তরে পণ করে প্রাণ
হও রে অগ্রসর।
হও রে দর্জী, কুমোর, কামার,
মুর্দাফরাশ, মুচি, চামার,
চাষা হয়ে সবল হাতে
লাঙল চেপে ধর॥

গাঁইতি ধরে কর না সড়ক,
কর না মিস্ত্রিগিরি।
ব্যোমযানেতে চেপে বসে
চল না আকাশ চিরি।
ডুব দে অতল সাগরজলে,
জোরসে চালা লোহার কলে,
কারখানাতে হাতুড়ি পিট,
যন্ত্র তৈরি কর॥

বচন কেবল সার হলো যে
কাজের বেলা ফাঁকি।
জীবন-জোড়া আলস্যেরে
রাখবি ক'দিন ঢাকি।
তার চেয়ে হ' কুলি মজুর,
ভাব-বিলাসে করে দে দূর,
থাকিস্ নে কেউ নিঝুম বসে,
একটা কিছু কর॥

এ কালের ছড়া

॥ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় ॥

'আয়রে আয় চাঁদামামা, টিপ দিয়ে যা'—
খোকনমণির কপাল জুড়ে টিপ দিয়ে যা।
না, না, না, টিপ চাই না, একটু আলো চাই,
কেরোসিনের অভাব বড়, দীপ জ্বলে না তাই।
বিজলীবাতি জ্বলবে ঘরে, তেমন কপাল নয়—
আমার ঘরে চাঁদ এলে কি আলোর অভার হয়?

খোকন সোনা, চাঁদের কণা, চাঁদ যে ভালোবেসে—
খোকন সোনার কপাল জুড়ে টিপ দেবে আজ এসে।
আলোর অভাব হবে না আর, চাই না কেরোসিন,
ছোট্ট আমার কুঁড়ে ঘরে, রাতেই হবে দিন।
বড় হয়ে খোকনমণি পড়বে কত বই—
ও চাঁদমামা দাও না গো টিপ, রাত ফুরোলো ঐ।

জানি, তুমি রাত ফুরোলেই আসবে না যে আর—
চাঁদমামা গো এত করে ডাকাই হ'ল সার!
সে কাল কবে হারিয়ে গেছে পাই নি কোন টের,
বোকার মত চলছি টেনে সেই কালেরই জের।
আয় রে আয় চাঁদামামা কি হবে আর ডেকে?
নতুন দিনের নতুন ছড়া লিখবো এখন থেকে।

॥ গৌরী চৌধুরী ॥

বুড়ো মাস্টার

ডাঃ বিভারের কথা শুনে বুট আর দস্তানা-জোড়ার দিকে আর একবার তাকাল কুপকুপ—এগুলোর মালিক কী ধরণের লোক হতে পারে!

বুটজোড়া বেশ বোম্বাই মাপের, কুপকুপের পায়ের চেয়ে ঢের বড়, দস্তানা-জোড়াও তাই। কিন্তু···কিন্তু···এমনও তো হতে পারে যে এগুলো মাস্টারমশায়ের নিজের নয়?

ডাঃ বিভার যেন ওর মনের কথাটা পড়ে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁর নিজেরই ওগুলো। যাক ভেতরে আসুন। স্বচক্ষেই দেখবেন।

খোলার আগে দরজায় টোকা দিলেন ডাঃ বিভার। ঢুকতে ঢুকতে শোনা গেল একটি হাসিখুশী গলা—

আসুন আসুন আসুন; বাইরে কেন, ভেতরে আসুন।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই কুপকুপ দেখতে পেল, বুট-দস্তানা এবং গলার মালিকটিকে। চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেল ওর।

ইনি হচ্ছেন শ্রীল্যাজন্দর গন্ধগোকুল। আমাদের মাস্টারমশাইদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ইনি।

কুপকুপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওঁকে। দেখতে শুনতে অনেকটা কাঠবিড়ালীদের মতই। তবে লেজটা অন্য রকম আর মুখটা আরো ছুঁচলো। চোখ দুটো কৌতুকে চক্‌চক্‌ করছে।

আর ইনি হচ্ছেন আমাদের একজামিনার, প্রফেসর কক্কড়।—ডাঃ বিভার কুপকুপের পরিচয় দিলেন।

কুপকুপকে নিরীক্ষণ করতে করতে ল্যাজন্দরবাবু বললেন—বাঃ, বাঃ, আজকাল তা হলে বেশ কম বয়সেই সব পাস-টাস করে—মিটিমিটি হাসতে লাগলেন ল্যাজাবাবু—আমার মতন থুত্থুড়ে না, কী?

ওঁর বয়েস আমার প্রায় ডবল—ডাঃ বিভার বললেন।

হ্যাঁ, খুশী গলায় বললেন ল্যাজন্দর—আমাদের আজকাল আর গণ্ডায় গণ্ডায় দেখতে পাওয়া যায় না। বোধহয় শেষ ঝড়তি-পড়তিদের মধ্যে আমি একজন। ক্লাসের দিকে ফিরলেন ল্যাজন্দর—

কি রে? তাই তো?

হাঁ স্যার, সমস্বরে বলল সবাই।

কেমন? ভাল শিখিয়েছি না? জ্বলজ্বলে মুখে কুপকুপের দিকে তাকালেন ল্যাজন্দর।

ছক্ বেঁধে কাজ করি, বুঝলেন? বুড়ো হতে পারি, কিন্তু সেকেলে নই—আবার মিটমিটিয়ে হাসতে লাগলেন ল্যাজন্দর।

ক্লাসের দিকে তাকাল কুপকুপ। তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, কেন এর নাম পাঁচমিশেলী ক্লাস। সামনের বেঞ্চে তিনটি খোকা-শেয়াল, ঐ ওধারে একটা ধবধবে সাদা বিল্লী সব্বাইকার থেকে আলাদা হয়ে বসে রয়েছে, বোধহয় পাছে রং কালো হয়ে যায় সেই ভয়ে। পাঁচটা খরগোশ—সেই কানুও তাদের মধ্যে রয়েছে, আর দু'টো সজারু—তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সেই মূর্তিমান গুড়গুড়ে, যিনি কুপকুপকে এই ইস্কুলে এনে হাজির করেছেন।

অন্য ক্লাসগুলোর চেয়ে এ ক্লাসটা লম্বায়-চওড়ায় ছোট, আবার ছাত্রও কম। চারধারে দেওয়ালে এর নকশানুকশি ছবি-টবি ঝুলছে—কতগুলো হাতে আঁকা, কতগুলো বই থেকে কেটে নেওয়া।

হাত-ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে ডাঃ বিভার বললেন—আমাদের হাতে আর খুব বেশি সময় নেই—আমার মনে হয়, আপনি দু'টো প্রশ্ন করুন। ওতেই আপনি বুঝতে পারবেন কোন ছেলে সবচেয়ে চালাক-চটপটে।

কথাটা মন্দ বলেন নি—কুপকুপ বলল। এই সেরেছে! কী প্রশ্ন করে এখন!

প্রশ্ন উত্তর দুই-ই চটপট বানিয়ে ফেলা যায় ঠিকই, কিন্তু বার বার ওরকম করলে তো হেডমাস্টার-মশায়ের সন্দেহ হবে। নাঃ, ওসব আর নয়, একটা সাদামাটা প্রশ্ন করা যাক।

ইঁইঁইঁইঁ—ডাঃ বিভার গলা পরিষ্কার করলেন—প্রফেসর, আমাদের হাতে কিন্তু আর বেশি সময় নেই।

তা জানি, তা জানি—কুপকুপ বলল তাড়াতাড়ি, এ-ই ভাবছিলুম একটু।

কুপকুপ থামল। দুই মাস্টার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—আমার এক নম্বর প্রশ্ন হল—আবার থামল কুপকুপ।

—আমার এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে—

সব্বোনাশ! কিছুই তো মাথায় আসছে না!

—ভূগোলের ওপর, তাই না? ল্যাজন্দরবাবু কথা যোগালেন—আমরা আজ ভূগোল পড়ছি ক্লাসে।

আঃ হা। ভূগোল, ঠিক বলেছেন, ভূগোল—বাঁচল কুপকুপ। চমৎকার, হঠাৎ প্রশ্নটা মনে এল কুপকুপের—

বল তো, ঐ সবুজ মাঠের পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, ওর নাম কী?

প্রশ্নটা করে ফেলেই মনে মনে মাথায় হাত দিল কুপকুপ। হয়েছে! উত্তরটা তো নিজেই জানে না ও!

ডাঃ বিভারকে একবার দেখে নিল কুপকুপ। কোন আশা নেই। ছেলেদের মত উনিও থতমত। কুপকুপের সঙ্গে চোখাচোখি হল ওঁর—

—পেটে আসছে মুখে আসছে না…বুঝলেন…'ব' দিয়ে আরম্ভ…উঁহু…প দিয়ে বোধহয়…

কুপকুপের হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। ল্যাজন্দরবাবুর দিকে তাকাল একবার; আরে! মিটমিট করে হাসছেন যে উনি। চোখ দু'টো আমোদে ঝিক্‌মিক্ করছে।

খাসা! খাসা!—বার বার বলতে লাগলেন ল্যাজন্দর—কী বুদ্ধির প্রশ্ন!

বুদ্ধিটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে—কুপকুপ ভাবছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, ল্যাজন্দরবাবু ছাড়া এ ঘরে আর কেউ ঠিক উত্তরটি জানে না। আর ডাঃ বিভার ঠিক উত্তরটা ভুলে গেলেও, ভুল উত্তর ঠিক ধরে ফেলবেন। এখন কী করে কুপকুপ?

শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে কুপকুপ বলল—কী হল? কেউ বলতে পারবে তোমরা?

ল্যাজন্দরবাবু বললেন—ওদের জিগ্যেস করে লাভ নেই, বুঝলেন। বড্ড কচি সব।

তবু আশায় আশায় সামনের মুখগুলোর দিকে তাকাল কুপকুপ। নাঃ, দু'টো খরগোশ ভুরু কুঁচকোচ্ছে আর সাদা বিড়ালটা কান চুলকোচ্ছে বটে, কিন্তু সারা ক্লাসে উত্তর দেবার মত একজনও নেই। কুপকুপ ভাবতে লাগল—কী করা যায়!

এক্ষুণি মনে পড়ল—ডাঃ বিভার বিড়বিড় করলেন—'ব'য়ে আকার…নাকি 'প'য় হস্‌সউ…

কি আর হবে, বলে দিন ওদের—ল্যাজন্দরবাবু বললেন—আপনি আমি ছাড়া আর কেউ তো জানে না দেখছি। এমন কি বিভার বুড়ো পর্যন্ত—থুড়ি, মাপ করবেন স্যার—এমন কি আমাদের হেডমাস্টারমশায় পর্যন্ত ভুলে গেছেন।

কুপকুপের নিবন্ত চোখ দপ্‌দপ্‌ করে উঠল হঠাৎ—আপনিও জানেন নাকি উত্তরটা? একটু যেন অবাক হয়েছে ও।

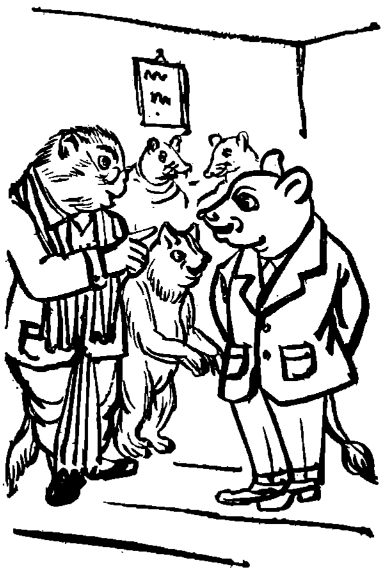

ল্যাজন্দরবাবু রেগে টং—

—আমি জানি কিনা! হুঁঃ, আমার তো মনে হয় জানি।

—শুনি, কী? কুপকুপ বলল।

—কেন, বুদ্‌বুদিয়া?

আঃ, বাঁচা গেল।

—ঐ তো, বুদ্‌বুদিয়া—ডাঃ বিভার চেঁচিয়ে উঠলেন—এ নাম ভোলা মানে তো, নিজের নামই ভুলে যাওয়া!

—ঠিক বলেছেন ল্যাজাবাবু, ঠিক বলেছেন—কুপকুপ বলল, যেন একটা ছোট ছেলেকে বলছে।

—ল্যাজন্দরবাবু—বললেন ল্যাজন্দর। তখনও রাগ যায় নি ওঁর।

—এর পরের প্রশ্নটা যদি আর একটু সোজা করেন—ডাঃ বিভার অনুনয় করলেন—আর একটুখানি সোজা।

—হ্যাঁ, প্রশ্নটা বেশ শক্তই ছিল—কুপকুপ বলল। উদ্দেশ্য, ল্যাজন্দরবাবুকে খুশী করা। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন ভেবে ওঠবার আগেই ডাঃ বিভার হঠাৎ হাত দু'টো তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি। হয়েছে। হ্যাঁ—বেশ উঁচু গলায় ক্লাস কাঁপিয়ে ডাঃ বিভার বললেন—যে ছেলে প্রথম মাথার ওপর দাঁড়াতে পারবে···না, না···ডেস্কের ওপর···নাও···চট্‌পট্‌ চট্‌পট্‌—

ছেলেরা হতভম্ব। কুপকুপ থ। ল্যাজন্দরবাবুর তো থুৎনিটা একেবারে বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার পরই সব ছাত্র বেঞ্চির ওপর লাফ দিয়ে ডেস্কের ওপর দাঁড়াতে আরম্ভ করল।

ঐ যে! ও পেরেছে! ডাঃ বিভার আঙুল দেখালেন। সেই গুড়গুড়ে!

—এটিই কি আপনার ক্লাসের সবচেয়ে চটপটে ছাত্র?

—হ্যাঁ, তা বেশ চালাক-চটক আছে—ল্যাজন্দরবাবু বললেন—কিন্তু কেন—

—দেখলুম কার কতটা কান খাড়া, মন খাড়া—ডাঃ বিভার বললেন—ঠিক আছে, এবার তোমরা নেমে পড়তে পার। প্রাইজ পেল গুড়গুড়ে।

কুপকুপ কী একটা বলতে গেল, হেডমাস্টারমশাই কানেই তুললেন না—

তাড়া দিচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না, একেবারেই সময় নেই আমাদের। আর আধ ঘন্টার মধ্যে স্পোর্টস্‌ আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। এখনো ছ-ছটা ক্লাস বাকী।

—ঠিক আছে, প্রত্যেক ক্লাসে না হয় একটা করে প্রশ্ন করব। কী বলেন?

কুপকুপ দিব্যি খুশী।

বেশ তো—তক্ষুণি রাজী ডাঃ বিভার—এবার কিন্তু আমাদের যেতে হয়।

—কিন্তু তার আগে ল্যাজন্দরবাবু কি দয়া করে বলবেন, দোরের ওপর ঐ বুট জুতো আর দস্তানা ঝোলানোর মানেটা?

সেই নদীর নাম কী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর, এই প্রথম হাসলেন ল্যাজন্দর—

ওটা? ওটা আমার একটা ছোট্ট খেয়াল। আর কিছু না। একটা খেয়াল শুধু—কথাটা যেন উড়িয়েই দিতে চাইলেন ল্যাজন্দর।

ডাঃ বিভার হাসলেন হঠাৎ মিটমিটিয়ে।

কুপকুপের কৌতূহল বাড়ল—বলুন না, বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে। একটু থেমে, ছোট্ট একটু যোগ করে দিল কুপকুপ—নির্ঘাৎ পেছনে কোন বুদ্ধির খেলা আছে?

ল্যাজন্দরবাবু বুকটা চিতিয়ে বললেন—কথাটা যখন বললেনই— [চলবে]

লবণাক্ত

॥ সুবীর চট্টোপাধ্যায় ॥

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে—ফুলকুমারী আর রূপকুমারী। একদিন রাজামশাই কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন তাদের—"বল তো মা, তোরা কেমন ভালবাসিস আমায়?"

বড় মেয়ে ফুলকুমারী বলল—"বাবা, আমি তোমাকে রাজভোগের মত ভালবাসি।"

সে কথা শুনে রাজা মনের আনন্দে তাঁর মহামূল্য গজমোতির হারখানা ফুলকুমারীর গলায় পরিয়ে দিলেন।

এবার রূপকুমারীর পালা। সে বললে—"বাবা, আমি তোমাকে নুনের মত ভালবাসি।"

"কি এত বড় কথা! আমায় অপমান!!" রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে উঠলেন। রূপকুমারীর ভাগ্যে জুটল নির্বাসন-দণ্ড।

দিন যায়। রূপকুমারীর কথা রাজামশাই ভুলেই গেছেন প্রায়। একদিন হয়েছে কি, রাজার পাচক সমস্ত খাবারে নুন দিতে ভুলে গেল। খাবার মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিলেন রাজামশাই। সমস্ত মুখটা বিস্বাদ হয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ফুলকুমারীর কথা। রাজা ভাবলেন—তাই তো, সে বলেছিল আমায় নুনের মত ভালবাসে। সত্যি, নুন না হলে তো একদম চলে না

আমাদের। ইস্ তাকে ভুল বুঝে কি অন্যায়টাই না করেছি আমি! অনুতাপে জ্বলতে জ্বলতে রাজা হুকুম দিলেন মন্ত্রী মশাইকে—"মন্ত্রী, শীঘ্রি পাইক বরকন্দাজ, ডুলি-পালকি পাঠাও। সারা রাজ্যে ঢ্যাড়া পিটিয়ে বলে দাও—যে আমার মা-মণিকে উদ্ধার করে আনতে পারবে, রাজকোষ উজাড় করে তাকে বকশিশ দেব।"

শুধু রসনা-তৃপ্তির জন্যই নয়, নুন বা লবণ আমাদের খাদ্যের একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান। লবণ আমাদের কোন প্রকার শক্তি বা এনার্জি (Energy) যোগায় না সত্যি, কিন্তু শরীর গঠন, সংরক্ষণ এবং শারীরিক কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য তার বিশেষ প্রয়োজন। আগের প্রবন্ধে (রক্তারক্তি—আষাঢ় ১৩৭৩) বলেছি যে, সমুদ্রের জলেই সর্বপ্রথম জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর বহু বিবর্তন ও ক্রমবিবর্তনের যুগ পেরিয়ে বর্তমান মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন সামুদ্রিক লবণ, আমাদের দেহকোষের গঠন এবং তাদের কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক এ কথা সহজেই অনুমেয়। সমুদ্রে যত রকমের লবণ পাওয়া যায়, আমাদের দেহেও ঠিক তত রকমের লবণ বর্তমান। রক্ত-রস বা ব্লাড-প্লাজমাকে (Blood Plasma) উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করালে দেখা যাবে যে, সমুদ্রের জলে বিভিন্ন লবণ যে পরিমাণে আছে, সে সমস্ত লবণ রক্ত-রসে প্রায় সেই পরিমাণেই বর্তমান।

সাধারণ 'নুন' বা 'লবণ' বলতে আমরা যা বুঝি, তার নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Chloride)। এটি একটি যৌগ বা কম্পাউণ্ড (Compound)। এর দু'টি উপাদান: সোডিয়াম (Sodium) ও ক্লোরিন (Chlorine)। সোডিয়াম হ'ল এক প্রকার ধাতু আর ক্লোরিন, গ্যাসীয় পদার্থ। এই দুই মৌলের সমন্বয়েই তৈরী হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড।

আমাদের শরীরের রক্ত এবং অন্যান্য শরীরের রস বা বডি-ফ্লুইড (Body Fluid) ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ বর্তমান। মল-মূত্র, ঘাম দ্বারা প্রত্যহ প্রচুর লবণ দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং খাদ্যে লবণ গ্রহণ করে তার পরিমাণ ঠিক রাখতে হবে। আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য-তালিকায় সাধারণতঃ এই কয়টি উপাদান থাকা উচিত। সেগুলো হল—প্রোটিন (Protein) বা আমিষ, ফ্যাট (Fat) বা চর্বি, কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা, ওয়াটার (Water) বা জল এবং সল্ট (Salt) বা লবণ।

সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও অন্যান্য প্রকার লবণ আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলো আলাদা ভাবে গ্রহণ করার দরকার হয় না, বিভিন্ন খাদ্যের মধ্য থেকেই সে সব পাওয়া যায়।

আয়রন (Iron) বা লোহা, ক্যাল্‌সিয়াম (Calcium), ফস্‌ফরাস (Phosphorus), সোডিয়াম (Sodium), কপার (Copper) বা তামা, ম্যাঙ্গানিজ (Manganise), পটাসিয়াম (Potassium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), ক্লোরিন (Chlorine), আয়োডিন (Iodine), ব্রোমিন (Bromine),

ফ্লুয়োরিন (Fluorine), জিঙ্ক (Zinc), সালফার (Sulphur), অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) ইত্যাদি লবণ আমাদের শরীরে বর্তমান। এগুলির মধ্য থেকে দু'একটি লবণের প্রয়োজনীয়তা, গুণাগুণ ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

যাবতীয় ফলে আয়রন বা লোহা বর্তমান। তাছাড়া শাকসব্জী এবং প্রাণিজ প্রায় সমস্ত খাদ্যেই (দুধ ও মাখন ছাড়া) লোহা থাকে। লোহা ছাড়া রক্ত তৈরী সম্ভব নয়। প্রতি একশো সি. সি. রক্তে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম লোহা থাকে। রক্তে শতকরা বিরানব্বই থেকে আটানব্বই ভাগ লোহাই হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামক যৌগ রূপে বর্তমান। দেহে লোহার ঘাটতি হলে এক রকমের রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া (Anaemia) রোগের সৃষ্টি হয়।

বিশেষ করে হার্ড ওয়াটার (Hard water) বা খরজলে এবং ডিম, দুধ, শাকসব্জী ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। দেহের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্যালসিয়ামই থাকে হাড় ও দাঁত হিসেবে। বাদবাকি মাত্র এক ভাগ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন টিসু (Tissue) ইত্যাদিতে। আমরা প্রত্যহ খাদ্যে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্রহণ করি, তার শতকরা মাত্র পঁচিশ ভাগ দেহে শোষিত হয়, বাদবাকি পঁচাত্তর ভাগই বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রতি একশো সি. সি. রক্তে প্রায় ছয় মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম বর্তমান। ক্যালসিয়ামের অভাবে যে বিশেষ রোগটি হয় তার নাম রিকেট (Ricket)।

মাছ, দুধ, ডিম, শাকসব্জী ইত্যাদিতে ফস্‌ফরাস বর্তমান। প্রতিটি দেহকোষেই (cell) ফস্‌ফরাস আছে। হাড় ও দাঁত তৈরীর কাজে ফস্‌ফরাসের সহায়তা দরকার। 'ফস্‌ফরাস ব্যতীত কার্বোহাইড্রেটের ইন্ধন জ্বলে না। জীবকোষ সমূহের এবং স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে পারে না।' (আহার ও আহার্য—পশুপতি ভট্টাচার্য)

বিভিন্ন খাদ্যে, দুধ এবং জল ইত্যাদিতে সোডিয়াম বর্তমান। তাছাড়া নুন হিসেবে প্রচুর সোডিয়াম আমরা প্রত্যহ গ্রহণ করে থাকি। রক্তে, প্রতি একশো সি. সি.-তে তিনশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম সোডিয়াম বর্তমান। সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের অভাবে রক্তের ক্ষার গুণ কমে যায় এবং শরীরের ক্ষতি হয়।

সত্যি কথা বলতে খাদ্যের চেয়ে লবণের প্রয়োজনীয়তা বেশী। কারণ দেহে লবণের ঘাটতি হলে, খুব শীঘ্র মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য বিভিন্ন খাদ্যের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যহই প্রচুর লবণ গ্রহণ করে থাকি যার ফলে চট করে দেহে লবণের ঘাটতি হয় না।

অস্বাভাবিক কারণে যদি কখনও দেহে লবণের পরিমাণ কমে যায়, তখন লবণ গ্রহণের এক স্বাভাবিক স্পৃহা জাগে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'সল্ট হাঙ্গার' (Salt Hunger), বাংলায় একে 'লবণ ক্ষুধা' বলা যেতে পারে।

বিদেশী গল্পগুচ্ছ

(৫) স্যার জেম্‌স্ ম্যাথু বেরী

॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ॥

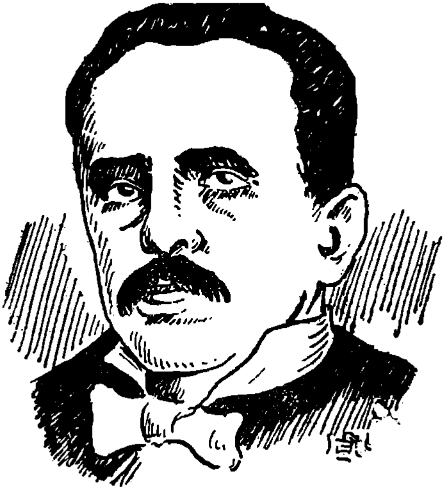

মিস্টার ডার্লিং ও মিসেস ডার্লিং নামে এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁদের ছিলো তিনটি বাচ্চা। তাদের নাম ছিলো ওয়েন্‌ডি ময়রা এন্‌জেলা, জন নেপোলিয়ান ও মাইকেল।

ডার্লিং দম্পতির একটা বিরাট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর ছিলো। কুকুরটির নাম ছিলো নানা। নানাই বাচ্চাদের দেখাশোনা করতো। সে ছিলো ওদের নার্স।

ডার্লিং দম্পতি নানার ওপর বাচ্চাদের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু একদিন রাতের বেলা একটা অঘটন ঘটে গেলো যার ফলে ডার্লিং দম্পতি সত্যি সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ রাতের বেলা অদ্ভুত চেহারার একটা বাচ্চা ছেলে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। আওয়াজ পেয়ে নানা জেগে উঠলো। সে বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ করতে করতে ছেলেটিকে তাড়া করে গেলো। ছেলেটি যেমন জানালা দিয়ে ঢুকেছিলো তেমনি বার হয়ে গেলো জানালা দিয়েই।

ঘরটি ছিলো চারতলায়। অত উঁচুতে ছেলেটি উঠলোই বা কি করে, নেমেই বা গেলো কি ভাবে। তারা সবাই একথা নিয়ে বলাবলি করতে লাগলো।

বাচ্চাটা বেরিয়ে যেতেই নানা জানালাটা বন্ধ করে দিলো। বাচ্চার যে ছায়া ঘরের ভেতর পড়েছিলো, সেটা ঘরের ভেতরই কিন্তু থেকে গেলো। হঠাৎ জানালা বন্ধ করে দেওয়ায় বাচ্চা তার ছায়া নিয়ে যেতে পারলো না।

মিসেস ডার্লিং ঘরে এসে ঢুকলেন। ছায়াটা তুলে নিয়ে, তিনি মুড়ে সেটাকে দেরাজে বন্ধ করে রাখলেন। মিসেস ডার্লিং ভাবলেন, সত্যি সত্যি নানা খুব কাজের। সে না থাকলে, আজ যে বাচ্চাদের কি হতো বলা যায় না।

একদিন রাতের বেলা মিস্টার ডার্লিংএর মেজাজ কেমন বিগড়ে গেলো। তিনি বললেন, "এ কি কাণ্ড আমাদের! একটা কুকুর হলো আমাদের ছেলেমেয়েদের আয়া! সে-ই ওদের দেখাশোনা করবে। এ কথা যে শুনবে, সেই কিন্তু হাসবে। দরকার নেই নানাকে ও ঘরে রাখবার। নানাকে বাইরে নিয়ে কুকুরের ঘরে বেঁধে রাখো।"...কর্ত্তার ইচ্ছায়ই কর্ম্ম, সুতরাং তাই হলো।

এরপর একদিন রাতের বেলায় আবার ঐ রহস্যময় ছেলেটি এলো বাচ্চাদের ঘরে। সেদিন ডার্লিং দম্পতি বাড়ী ছিলেন না। এদিকে নানাও ঐ ঘরে নেই। সে নিশ্চিন্তমনে ঘরে ঢুকলো। এই ছেলেটির নামই পিটার প্যান। ভারী কোমল একটা আলো ওর সাথে সাথে ঘরের ভেতর ঘুরঘুর করে ঘুরতে লাগলো, আর সেই আলোটা চলবার সাথে সাথে ভারী মিষ্টি আওয়াজ হতে লাগলো, রিন্ টিন্ টিন্। আলোটা চলা বন্ধ করতেই বোঝা গেলো যে ঐ আলো শুধু আলো নয়, পরীর মেয়ে। ওর কথা বলার সময়েও ঐ রকম মিষ্টি আওয়াজ ওর মুখ থেকে ঝরে পড়ছিলো। ওর এই মিষ্টি আওয়াজের জন্য ওকে সবাই ডাকতো 'টিংকার বেল'। মেয়েটি ঘুরঘুর করতে করতে ঐ দেরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে পিটারকে বললো যে, তার ছায়া এই দেরাজে বন্ধ রয়েছে। পিটার দেরাজ খুলে ছায়াটা বার করলো। কিন্তু ছায়াটা গায়ে পড়তেই সে নিরাশ হলো। ছায়াটা যে এখন তার গায়ে লাগে না। পিটার চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

তার চীৎকারে ওয়েন্‌ডির ঘুম ভেঙে গেলো। সে একটা সূই আর সূতো নিয়ে সেলাই করে পিটারের গায়ে ছায়াটা আটকে দিলো। পিটার আনন্দে নাচতে সুরু করলো। পিটার দেখলো যে এখন ঠিক হয়েছে, তার নড়াচড়ার সাথে সাথে ছায়াও ঠিক ভাবে নড়ছে।

ওয়েন্‌ডি পিটারকে জিজ্ঞেস করলো—"তুমি কোথায় থাকো ভাই?"

পিটার বললো—"ডানে গিয়ে দুই, ভোর হলে ছুঁই।"

ওয়েন্‌ডি ভাবলো—এ আবার কি অদ্ভুত ঠিকানা!

পিটারকে ওয়েন্‌ডির পরের প্রশ্ন হলো—"তোমার বয়স কত?"

পিটার বললো—"জানি না। তবে খুবই কম। জন্মের দিনই আমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছি। জন্মের পরই বাবা আর মায়ের কথা শুনে আমার মনে হলো বড় হলে আমি ভারী অদ্ভুত হবো। তাই আমি আর বড় হতে চাই না। ছোটই থাকতে চাই, রং-তামাসা করে দিন কাটাতে চাই। তাই আমি বাড়ী ছেড়ে পরীদের রাজ্যে চলে এসেছি।"

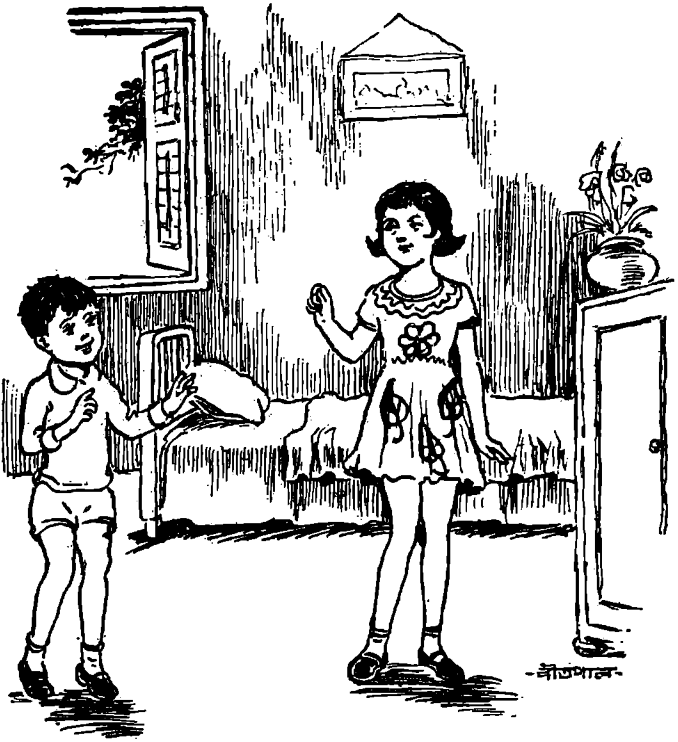

ওয়েন্ডি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা পিটার, তুমি ত পরীদের কথা সবই জানো। বল তো ওরা কে?"

পিটার জবাবে বললো—"হাঁ জানি বৈ কি? ওরা ত এখন নির্ব্বংশ হতে চলেছে। পৃথিবীর আলো দেখে যখন শিশু প্রথম হাসি হাসে, সেই হাসি যখন খান-খান হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ওর এক একটি টুকরো থেকেই জন্ম হয় এক একজন পরীর। সুতরাং সব ছেলেমেয়ের সাথে সাথেই একজন করে পরী রয়েছে। কিন্তু যখন যে শিশু বলে যে, সে পরী বিশ্বাস করে না, তখনই তার পরীটি যায় মরে।"

এরপরও পিটার বলে চললো যে সে থাকে এক অসম্ভবের দেশে, ওই দেশের নাম আজব দেশ। সেখানে ঠেলাগাড়ী থেকে পড়ে হারিয়ে যাওয়া সব বাচ্চারা থাকে। ওদের আয়ারা ওদের খুঁজে বেড়ায়, পায় না। সে-ই ঐ সব ছেলের দলের সর্দার। ভারী মজা ও আনন্দে রয়েছে তারা সব। তাদের ঐ দেশে একটি জিনিসের কিন্তু খুব অভাব। সে দেশে কোনো মেয়ে নেই। মেয়েরা ত আর ছেলেদের মত এত বোকা নয়, ওরা গড়িয়ে ঠেলাগাড়ী থেকে পড়ে যায় না, হারিয়েও যায় না। পিটার ভারী কাতরভাবে ওয়েন্ডিকে বলে—"যাবে তুমি আমাদের দেশে? তুমি আমাদের মা হবে?"

ওয়েন্ডি প্রথমটায় ইতস্তত: করতে লাগলো। তার নিজের মায়ের কথা তার মনে পড়ে গেলো। ভাইদের কথাও সে ভাবলো।

কিন্তু পিটার ত ছাড়বার পাত্র নয়। সে ওয়েন্ডিকে আজব দেশের আজব সব কাহিনী বলে বলে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করলো। সে আরও বললো—"দেখবে আমি মাইকেল আর

জনকেও উড়তে শেখাবো।” এই বলেই পিটার মাইকেল আর জনের গায়ে কি কতকগুলো গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলো। ওরা উড়তে উড়তে তারায় ভরা আকাশের নীচ দিয়ে আজব দেশে গিয়ে পৌঁছলো।

পিটারের ফিরে আসার জন্য আজব দেশের বাচ্চারা ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। এমনি সময় তারা দেখতে পেলো সাদা একটা পাখী উড়তে উড়তে তাদের দেশের দিকেই আসছে। এমনি সময় পরী টিংকার বেল সেখানে এসে হাজির। সে বললো—“পিটার প্যান ঐ পাখীটাকে গুলী করে মারতে বলেছে।”

সাথে সাথেই ওরা বন্দুক তুলে নিয়ে পাখীটাকে গুলী করলো। পাখীটা মাটিতে পড়তেই দেখা গেলো সেটা পাখী নয়, একটি মেয়ে।

এই মেয়েটি যে কে তা হয়ত তোমরা বুঝতে পারো নি। এই মেয়েটিই হচ্ছে ওয়েন্‌ডি। পিটার তাকে দলের মা করবে বলে, টিংকার বেল এখন ওয়েন্‌ডিকে হিংসা করতে সুরু করেছিলো।

ওয়েন্‌ডি কিন্তু মরে নি, সে সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারিয়েছিলো মাত্র। একটু পরেই সে জ্ঞান ফিরে পেলো। কিন্তু তার নিজেকে ভারী দুর্ব্বল মনে হলো। বাচ্চারা সবাই মিলে তার জন্য একটা ছোট ঘর তৈরী করে দিলো। প্রত্যেক রাত্রিতেই ওয়েন্‌ডি তার ঘর থেকে বেরিয়ে বাচ্চাদের কাছে, যেখানে একটা গাছের শেকড়ের নীচে তারা থাকতো, সেখানে যেতো। গিয়ে কত মজার মজার গল্প তাদের বলতো। তারপর ওদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিজের ঘরে ফিরে আসতো।

আজব দেশে মাঝে মাঝে ভারী লোমহর্ষক দুঃসাহসী অভিযানের ব্যাপারও যে না ঘটতো তা নয়। এই আজব দেশে ছিলো নানা রকম হিংস্র জানোয়ার, ভালুক, জলদস্যু, রেড্ ইণ্ডিয়ান আর ছিলো পরী।

ক্যাপটেন হুক ছিলো বড় একজন ডাকাত। একবার এই ডাকাতদের সাথে যুদ্ধের সময় পিটার হুকের একটা হাত কেটে দেয়। সেই কাটা হাতটা পিটার ফেলে দিয়েছিলো কুমীরের মুখে। কুমীর সেটা খেয়ে ভারী স্বাদ পায়। সেই থেকে কুমীর হুকের শরীরের বাকী অংশের খোঁজে সারা পৃথিবীর নদীতে নদীতে সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই কুমীরটা একবার একটা এলার্ম ঘড়ী খেয়ে ফেলে। সেই ঘড়ীর এলার্মের আওয়াজ কুমীরের পেটের ভেতর থেকেও শোনা যেতো। তাই ক্যাপটেন হুক বেঁচে গিয়েছে। আওয়াজ পেতেই সে সাবধান হয়ে যেতো। যাই হোক হুক কিন্তু পিটারকে একেবারেই দেখতে পারতো না। সে ভাবতো পিটারই তার সব দুঃখের কারণ। হুক সব সময় বাচ্চাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করতো। কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানদের কড়া পাহারা থাকার জন্য পারতো না।

একদিন সন্ধ্যায় ওয়েন্ডি বাচ্চাদের কাছে তার নিজের বাড়ীঘরের কথা সব বলছিলো। সে বলছিলো তারা চলে আসায় তার বাবা মা কত একা একা বোধ করছেন। তাঁরা এখনও নিশ্চয়ই রাতের বেলা জানালা খুলে রাখেন, তাদের ফিরে যাবার জন্য।

এবার পিটার তার নিজের গল্প বলতে সুরু করলো—"আমার মা-ও রোজ রাত্রে জানালা খুলে রাখতেন। একদিন রাতের বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফিরতে গিয়ে দেখি জানালা বন্ধ। মা বোধ হয় আমার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন নাকি বুঝতে পারলাম না। আমার বিছানায় অন্য একটি শিশু শুয়েছিলো।"

এ ঘটনা হয়ত সত্য নয়, কিন্তু পিটার এই ঘটনাটি সত্য বলে বিশ্বাস করতো। তার এই গল্প শুনে অন্যান্য বাচ্চারা ভারী ভয় পেয়ে গেলো।

ওয়েন্ডিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। সে ভাবলো এক্ষুণি বাড়ী ফিরবে। তাই তার ভাইদের চেঁচিয়ে ডাকলো, বললো—"চল, বাড়ী ফিরে যাই।"

সব বাচ্চাই কিন্তু তাদের বাড়ী ফিরতে নিষেধ করলো। তারা বললো—"তোমরা চলে গেলে আমাদের সব আনন্দ নষ্ট হবে। তোমরা যেও না।"

ওরা বললো—"তোমরাও আমাদের সাথে চল। আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। আমাদের বাবা-মাই তোমাদের বাবা মা হবেন। সেখানেই খাবে দাবে, মহা আনন্দে থাকবে।"

পিটার কিন্তু যেতে রাজী হলো না। সে বললো—"আমি অন্যান্য বাচ্চার মত বড় হয়ে উঠতে চাই না। আমি চিরদিনই ছোট থাকতে চাই।"

ওয়েন্ডি আর তার ভাইরা পিটারের দেওয়া গুঁড়ো গায়ে ঢেলে পরী হয়ে উড়ে নিজেদের দেশে চলে যাবে বলে ঘর থেকে বাইরে এলো। অন্যান্য বাচ্চারাও তাদের সাথে বাইরে এলো।

এদিকে দস্যুরা বাইরে ওঁৎ পেতে ছিলো। সবাই বাইরে আসতেই তারা তাদের ধরে জাহাজে নিয়ে গেলো। তারা পিটারকে না পেয়ে তার খোঁজে তার ঘরে গেলো। পিটার তখন তার ঘরে ঘুমুচ্ছিলো। তাকে ওই অবস্থায় দেখে ওষুধের গুঁড়োর সাথে ওরা গোপনে বিষ মিশিয়ে দিয়ে গেলো।

পিটার ঘুম ভেঙে ওষুধ খেতে গেলো। এদিকে কোত্থেকে আওয়াজ এলো—"খেয়ো না, খেয়ো না, ওতে বিষ আছে।"

পিটার সে কথা শুনলো না। সে গ্লাসটা তুলে যেই ওষুধ মুখে ঢালতে যাবে. অমনি কে যেন ছুটে এসে তার হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিলো। এ আর কেউ নয়, পরী টিংকার বেল। সে পিটারের হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিয়ে ওষুধটা নিজের মুখে ঢেলে দিলো। সাথে সাথেই তার মৃত্যু এগিয়ে আসতে লাগলো। একে বাঁচাবার একটি পথই পিটারের জানা ছিলো। সেই পথটিই

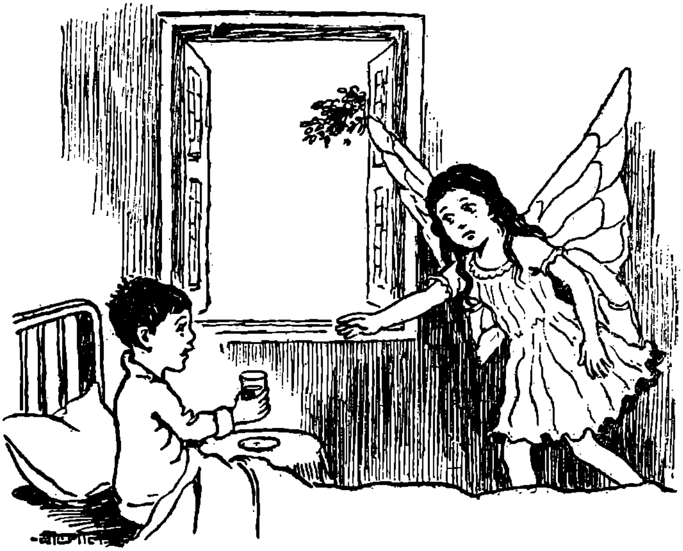

সে অনুসরণ করলো। চীৎকার করে সে বলে উঠলো—"সারা দুনিয়ার ছেলে-মেয়েরা শোনো, তোমরা কি পরীতে বিশ্বাস কর? যদি বিশ্বাস কর তবে হাততালি দেও।"

কি আশ্চর্য্য, একথা বলবার সাথে সাথেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাততালির আওয়াজ আসতে লাগলো। আর সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে উঠলো—টিংকার বেল।

টিংকার বেল তখন পিটারকে ওয়েন্‌ডি, তার দুই ভাই ও অন্যান্য বাচ্চাদের যে দস্যুরা তাদের জাহাজে ধরে নিয়ে গিয়েছে সে কথা জানালো।

শুনেই পিটার ছুটলো ওদের উদ্ধার করতে। সে বললো—"এই হারামজাদা ডাকাতদের আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।" সে জাহাজের দিকে ছুটে চললো। জাহাজের কাছে যেতেই পিটার দেখলো—হুক সবাইকে টেনে টেনে জাহাজে ওঠাচ্ছে।

এই সময়ে ঘড়ীর আওয়াজ শোনা গেলো—টিক টিক টিক! চারদিকে রব উঠলো—"কুমীর কুমীর!"

ভয়ে দস্যুরা সব যে যেদিকে পারলো পালালো। হুক একা বিপদে পড়ে গেলো। সুতরাং সে সহজেই কাবু হয়ে গেলো।

দুর্দ্ধর্ষ দস্যু হুক ভাবলো পিটার নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তির অধিকারী। যখন হুক প্রায় কোণঠাঁসা হয়ে এসেছে তখন সে পিটার প্যানকে প্রশ্ন করলো—"প্যান, তুমি কে?"

পিটার জবাব দিলো—"শুনবে, শুনবে, কে আমি? আমি শিশু, চিরন্তন শিশু। আমি আকাশে এক নবোদিত সূর্য্য, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতই আমি। আমি ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসা পাখীর ছানা। শোনো, শোনো তবে বলছি তোমায়, আনন্দ, চির আনন্দ আমি।"

এই কথা বলেই পিটার হুকের হাত থেকে তরোয়ালখানা ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে ঠেলে কুমীরের মুখে ফেলে দিলো।

এখন জাহাজখানা পিটারের অধিকারে। এখন পিটারই জাহাজের হর্তাকর্তা।

জাহাজখানা চালিয়ে তারা বাড়ীর দিকে নিয়ে গেলো। বাড়ীর আবহাওয়া তখন বাচ্চাদের অভাবে বিষাদে ভরা। নানাকে বাচ্চাদের ঘর থেকে সরিয়ে দেবার ফলেই যে এই কাণ্ড ঘটা সম্ভব হয়েছে, তা মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝতে পেরেছিলেন মিস্টার ডার্লিং। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মিস্টার ডার্লিং এখন নানার সাথে তার ঘরেই ঘুমোতে সুরু করেছিলেন। তিনি ছেলেমেয়েদের ফিরে আসার জন্য সব সময়েই বাচ্চাদের ঘরের জানালা খোলা রাখতেন।

এবার বাচ্চারা তাদের মায়ের কোলে ফিরে এলো। কি আনন্দ আজ সবার।

পিটার জানালা দিয়ে সব দেখলো। বহু আনন্দ তার জীবনে ছিলো, যে আনন্দ সাধারণ ছেলেমেয়েরা জীবনে পায় নি কখনো। সুতরাং এ সহজ সরল স্বাভাবিক আনন্দ তার কাম্য নয়।

মিসেস ডার্লিং অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে পিটারকেও তাঁর সন্তান হিসেবে তাঁর বাড়ীতে রাখতে চাইলেন। কিন্তু সে রাজী হলো না।

পিটারেরও মায়ের প্রয়োজন। সে মা চায় একজন। তারই বয়সের মা সে চায়। তাই সে তারই বয়সী ওয়েন্‌ডিকেই মা ঠিক করে নিয়েছিলো।

সে ত বড় হতে চায় না। মিসেস ডার্লিং তার কথা শুনে, তার মায়ের অভাবের জন্য কেমন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ওর জন্য সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় গলে গেলো। তিনি বললেন—"তোমার কোনো ভাবনা নেই, পিটার। প্রতি বসন্তে যখন ফুলে ফুলে সারা দুনিয়া হেসে উঠবে, যখন বাইরে মিঠেল হাওয়া বইবে, পাখীর ডাকে ডাকে সারা দুনিয়া যখন মুখরিত হয়ে উঠবে, তখন ওয়েন্‌ডি যাবে তোমার ওখানে।"

বছরের পর বছর কেটে যায়, বাচ্চারা সব বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু পিটার যেমন তেমনি থেকে যায়। আজব দেশের এক গাছের মাথায় ছোট একটি ঘরে থাকে পিটার। পরীরা পিটারের জন্য এই ঘর তৈরী করে দিয়েছে। এখানে টিংকার বেলও থাকে। ওয়েন্‌ডির জন্যও যে ঘর ছিলো, সে এলে সেও সেখানে থাকে। শিশু, চিরন্তন শিশু পিটার। এভাবেই চলে তার জীবন।

পিটার প্যানের গল্পটি তোমরা শুনলে। এবারে শোনো পিটার প্যানের লেখক স্যার জেম্‌স্ মেথু্ বেরীর কথা।

বেরী হচ্ছেন ইংরেজী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত নাট্যকার। ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। নাট্যকার হিসেবে ইংল্যাণ্ড পেয়েছে সেকস্‌পিয়ারের মত অবিস্মরণীয় প্রতিভা। সুতরাং বেশ কিছুকাল থেকেই নাট্য-সাহিত্য এক সম্মানজনক স্থান অধিকার করে রয়েছে ইংরেজী সাহিত্যে।

শক্তিশালী নাট্যকার হিসেবে বেরীরও এক সম্মানজনক স্থান রয়েছে ইংরেজী সাহিত্যে। এ যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে যাঁদের নাম, বেরী তাঁদের অন্যতম।

স্কটল্যাণ্ডের ফোরফারশায়ারের কিরিমুয়ের নামে এক অখ্যাত পল্লী হচ্ছে বেরীর জন্মস্থান। বেরীকে বুকে ধারণ করে এই পল্লী আজ সুপরিচিত হয়ে উঠেছে জনসাধারণের কাছে। বেরী তাঁর রচনায় এক ছদ্মনামে এই পল্লীকে দিয়েছেন সম্মানের স্থান। থ্রাম্স্ এই ছদ্মনামে তাঁর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামের কথা বলতে গিয়ে কোথাও কোথাও তিনি উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। থ্রাম্স্ এই ছদ্মনামে বেরীর জন্মভূমি কিরিমুয়ের তাঁর সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

বেরীর ছেলেবেলাটা কেটেছিলো তাঁর স্বগ্রামে। তাঁর মা ছিলেন চিররুগ্ণা। তাই তাঁর সেবার জন্য সব সময়েই তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে কাছেই থাকতে হতো। মায়ের সর্ব্ব সময়ের সহচর ছিলেন বালক বেরী। হাসি-তামাসা রঙ্গ-রস এই সব করে মাকে তাঁর সব সময়ে আনন্দে রাখতে হতো।

ছেলেবেলা থেকে এভাবে হাসি-তামাসায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ফলে, পরবর্ত্তী সময়ে তাঁর সাহিত্যেও এর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিলো। যে অদ্ভুত শ্লেষ, যে ব্যঙ্গ তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহিত্যে তার সূচনা বাল্যকালেই হয়েছিলো।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে কিরিমুয়েরে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ডেভিড বেরী, একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁতী। জেম্স্ বেরী ছিলেন মাতাপিতার নবম সন্তান। বাল্যকালের শিক্ষা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সমাপ্ত করে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে স্নাতক হ'ন।

এরপর তিনি সাংবাদিকের কার্য্যে প্রবেশ করেন। সংবাদপত্রে তাঁর যেসব রচনা প্রকাশিত হতে থাকে সেগুলো বিশেষ সাহিত্যিক মূল্যের জন্য ক্রমে ক্রমে পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এরপর তিনি সুরু করেন নাটক রচনা। তাঁর রচিত নাটকগুলো রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। নাট্যকার হিসেবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এভাবে সাহিত্য-জগতে তিনি সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে বৃটিশ সরকার তাঁকে নাইট (স্যার) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

জেম্স্ বেরীর নাটকগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে এগুলো শুধু মঞ্চ-সফল নাটকই নয়, এসব নাটকের সাহিত্য-মূল্যও অনস্বীকার্য্য। বহু প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায়ও বেরীর নাটকের স্থান রয়েছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর বেরী শিশু-সাহিত্য রচনায় আকৃষ্ট হন। তাঁর রচিত কয়েকখানা শিশু-সাহিত্যের মধ্যে তিনখানা বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দি লিটল হোয়াইট বার্ড (ছোট্ট সাদা পাখীটি), পিটার প্যান ইন কেনসিংটন গার্ডেনস (কেনসিংটন বাগানে পিটার প্যান), পিটার অ্যাণ্ড ওয়েন্‌ডি বিশেষ সুপরিচিত এবং শিশু-সাহিত্যে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

এই তিনখানা বইয়ের কাহিনী অবলম্বনে তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটক 'পিটার প্যান' রচনা করেন। মঞ্চস্থ হবার সাথে সাথেই নাটকটি অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে।

তাঁর নাটকগুলোতে হাস্যরসের ছড়াছড়ি রয়েছে। শ্লেষেরও অভাব নেই তাঁর নাটকে। কৌতুকও যথেষ্ট রয়েছে।

পিটার প্যানই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বীকৃত।

উপন্যাস রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সব উপন্যাসের আঙ্গিক তিনি বিশেষভাবে স্কটল্যাণ্ডের তৎকালীন সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেছেন। স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্যভাষা ব্যবহারের ফলে তাঁর উপন্যাসগুলোর আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটি বিশেষ ছদ্মনামে তিনি তাঁর গ্রামের মানুষদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা প্রায় জীবন্ত। তাঁর শৈশবের বহু উজ্জ্বল দুঃখের স্মৃতি এসব বইয়ে রয়েছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁর দেহ তাঁর স্বগ্রামে নিয়ে সমাধিস্থ করা হয়।

শিবাজীর মহানুভবতা

॥ শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

মারাঠা সেনারা যুদ্ধ করিয়া বিশাল দলে—
পারেনি দখলে আনিতে দুর্গ বিপুল বলে!
গত এক মাস সমানে যুঝিয়া
পায় নিকো পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া;
বেলভাড়িয়ার দুর্গ বাহিরে যুদ্ধ চলে।
শত্রু-সেনার ভীষণ প্রকোপ শৌর্যে জ্বলে!

মারাঠা সেনার গতিরোধ করে বীরাঙ্গনা,—
আত্ম-রক্ষা করিছে দুর্গে সকল জনা।
সাধ্য কাহার পাহাড়ে টিলায়—
দুর্গের দিকে সামনে আগায়!
চারি দিকে যেন উদ্যত শত শত্রু-ফণা,—
যুদ্ধ জয়েরি দীর্ঘ মেয়াদী এ-জল্পনা!

এদিকে দুর্গে কঠিন ব্যাপার—রসদ নাই—
খাদ্যাভাবেই সেনারা ভীষণ ক্ষুব্ধ তাই !
কেল্লার দ্বার মোচন করি',—
বাহিরে আসিল দুর্বার অরি !
মরিয়া-সৈন্য মারিয়া অরাতি মরিতে চাই ।
মারাঠার কাছে শির নোয়াবে না সাবিত্রী বাঈ।

সাতশ' সেনাই মারমুখো হয়ে যুদ্ধ করে,
প্রবল মারাঠা বাহিনী তাদের ঘিরিয়া ধরে ।
সাবিত্রী তাই জাগাতে চেতনা,
বিলান খুলিয়া আপন গহনা ।
মহাবিক্রমে সেনারা আবার হল্লা করে,
বীরাঙ্গনার সর্বাঙ্গেই শোণিত ঝরে !

সন্ধ্যা আকাশে ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার,
সহসা কে যেন খঞ্জ করিল ঘোড়াটি তাঁর !
সাবিত্রী বাঈ দাঁড়ায়ে মাটিতে,
ঝাঁপায়ে পড়িছে শত্রু-ঘাঁটিতে,
বিদ্যুৎ-বেগে তরবারি হাতে বারংবার !
কাটিল আঘাতে ডান হাতখানি সহসা তাঁর !

মারাঠা সেনারা তাঁহাকে তখনি বন্দী করে ;
সাখুজী আসিয়া কটু কথা বলে উচ্চস্বরে !
শৃঙ্খলে বাঁধি' মহা উল্লাসে
সেনারা পৌঁছে শিবাজী সকাশে,
বন্দিনী বেশে বীরাঙ্গনায় হাজির করে,—
অপরাধিনীর কৃত কর্মের বিচার তরে !

শৃঙ্খল-পরা রমণীরে হেরি' শিবাজী বীর
সম্ভ্রম-ভরে করেন তখন আনত শির ।
বন্ধন-ভার করিয়া মোচন,
বলেন, "যাও মা ফিরিয়া এখন,—
ভবিষ্যতের সব ভার নিল শিবাজী বীর ।"
সে কথা শুনিয়া ঝরে রমণীর অশ্রুনীর !

সাখুজীরে ডাকি' শিবাজী বলেন, "স্পর্ধা বড়ো !—
শয়তানটাকে কারাগারে দাও, কোতল করো !
মায়ের গায়ে যে তুলেছে হাত,
সে নয় মানুষ, কুকুরের জাত !"
ক্রুদ্ধ শিবাজী গর্জে ওঠেন প্রবলতর—
"জল্‌দি এখুনি দুষমনটাকে বন্দী করো ”

শয়তানের থাবা

॥ শ্রীচিত্ত ঘোষাল ॥

মেমসায়েব···মেমসায়েব !

এমন একটা আতঙ্কভরা সাবধানী ডাক শুনতে পেল না জোয়ান। আধঘন্টা ধরে হাঁটার পর এতক্ষণে সে খুঁজে পেয়েছে মাছধরার মনোমত জায়গা। হাতে ছিপটা নিয়ে সেই জায়গাটা দেখতেই সে তন্ময় হয়ে গেছে। বৎসরের সব সময়েই বরফ-ঢাকা নন্দাদেবীর পাঁচ মাইল উঁচু চূড়ার কিছু অংশ গাছের ফাঁক দিয়ে এসে নদীর সেইখানটায় ঢেউ-এর সঙ্গে দোল খাচ্ছে। সেই দৃশ্য আর মাছধরার স্বপ্নে মশগুল জোয়ানের কানে ডাক পৌঁছুল না।

মেমসায়েব···মেমসায়েব···বাঘ !—গোবিন্দ সিং আবার সতর্ক করে দিল।

এবার শুনতে পেয়েছে জোয়ান আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল তার দেহে কে যেন একরাশ বরফ চাপিয়ে দিল। এমন একটা ভয়ের মুখে যে তাকে পড়তে হবে, ভাবতেও পারে নি সে। মাত্র দশদিন হল ভারতে এসেছে জোয়ান বাবার কাছে। ওর বাবা হলেন এখানকার ফরেস্ট-কমিশনার। বনের তদারকি, বনের পশুপক্ষীদের দেখার দায়িত্ব তাঁর। অনেকদিন ধরেই ভারতে আসবার জন্য জোয়ান বাবাকে তাগিদ দিচ্ছিল। আর ওর বাবা বরাবরই খরচের অজুহাত দিয়ে মেয়ের আবদার কাটিয়ে আসছিলেন। কিন্তু জোয়ানের দাদু মারা যাবার পর, বাবা আর কোন আপত্তি জানাতে পারেন নি। কেননা, দাদুর অনেক টাকা ছিল, তার সবটাই পেয়েছে জোয়ান। একদিন সোজা উড়োজাহাজে চেপে বসল সে। দিল্লী হয়ে সোজা চলে এল নৈনিতাল—হিমালয়ের ছায়া-ঘেরা নৈনিতাল। এখানেই থাকতেন জোয়ানের বাবা আর মা।

এখানে আসার পর আজই সে প্রথম মাছ ধরতে যাবার অনুমতি পেয়েছে। তবে সে একা বেরোয় নি। সঙ্গে রয়েছে গোবিন্দ সিং—তার বাপের বহুদিনের পুরোনো বিশ্বস্ত কর্মচারী। গোবিন্দ সিং-এর বয়স হয়েছিল অনেক। বয়সের ভারে চুলে ধরেছিল পাকা আতার রঙ। কিন্তু তার চাল-চলনে কোথাও বার্ধক্যের ছায়াটুকুও পড়ে নি। তার দেহে তখনও যেমন ছিল অফুরন্ত শক্তি, মনেও ছিল তেমনি দুরন্ত সাহস। এক কাঁধে মেমসায়েবের জন্য টুকিটাকি খাবার আর এক কাঁধে একটা ভারী দোলনা বন্দুক নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি মেলেই সে চলেছিল মেমসাহেবের সঙ্গে। জোয়ানের ভাল না লাগলেও আপত্তি করার উপায় ছিল না। বাবা তাকে আগেভাগেই সাবধান

করে দিয়েছিলেন—এখানকার পথ-ঘাট তেমন নিরাপদ নয়। চিতার দেখা তো হামেশাই মেলে, এমন কি সময় সময় নরখাদক বাঘের দেখা পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আজই যে সেই বাঘের মুখোমুখি হতে হবে জোয়ান তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। যেখানে গোবিন্দ সিং বসে আছে, তার থেকে মাত্র আট-দশ হাত দূরে ঝোপকে ফুঁাক করে বেরিয়ে এসেছে বাঘের কদাকার মুখটা। গন্‌গনে আগুনের মত তার চোখদুটো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে—যেন একটা লালসার হিংস্র আগুন। আতঙ্কে জোয়ানের হৃৎকম্প শুরু হল। নিজেকে যতই সংযত করার চেষ্টা করে জোয়ান, কম্পন যেন ততই বাড়তে থাকে। পড়ে যাবে নাকি জোয়ান? বুকের ভিতরের হাড়গুলোর ঠক্-ঠক্ শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছে। একবার ভাল করে চারদিক তাকিয়ে নিল সে। ছোট্ট নদীর জলে ঠিক আগের মতই ঢেউগুলো ছুটে ছুটে চলেছে। একঝাঁক লেজঝোলা পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

সাবধান মেমসায়েব, একটুও নড়চড় করবেন না, তা হলে কিন্তু বিপদে পড়বেন।

চমকে ফিরে দেখে জোয়ান, সেই ছোট্ট টিলাটায় তখনও গোবিন্দ সিং বসে আছে নির্ভীক-ভাবে। তারও চোখ দুটো জ্বলছে। দাড়িভর্তি ছুঁচোলো মুখটা ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছে। খুব সন্তর্পণে সে তুলে নিচ্ছে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখা বন্দুকটা। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। চতুর্দিক যেন নীরব মরুভূমি।

হঠাৎ নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে কে যেন কঁকিয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ, তীব্র সেই স্বর যেন অন্তর ভেদ করে যায়। এই আর্তনাদ বুঝতে জোয়ানের ভুল হয় নি। বাবার মুখে অনেকবারই শুনেছে সে কাকাড়ের কাহিনী। বাঘ বেরোলেই এরা বেরোয়—আর বাঘের পিছনে পিছনে এরা চীৎকার করে ফেরে!

আর একবার ভয়টা জোয়ানের সারা দেহটাকে ধরে যেন ঝাঁকিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল একটা বন্দুকের গুলী তার পা ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। পড়ে গিয়েছিল জোয়ান। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখল টিলার নীচে গড়িয়ে পড়ে আছে গোবিন্দ সিং। ব্যাপারটা কি হয়েছিল, বুঝতে বাকী রইল না জোয়ানের। একটুর জন্য খুব বেঁচে গেছে গোবিন্দ সিং। ভাগ্যে ঠিক সেই সময়েই গোল পাথরটায় পা পড়ে গিয়েছিল। না হলে—।

কিন্তু এ কী হল জোয়ানের? পা দুটো নড়তে চাইছে না কেন? মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। বুঝতে পারে জোয়ান, ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয় করলে কি চলবে!

এক—দুই—তিন—চার···। বাবার কথাই সত্যি। ধীরে ধীরে যেন ভয়টা পাতলা হয়ে আসছে। সাত—আট। না, আর একটুও ভয় করছে না জোয়ানের।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে গোবিন্দ সিং-এর হাত দুটো তুলে ধরে বসাল জোয়ান।

— তোমার বড্ড লেগেছে, না ?

—পা-টা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে, মেমসা'ব। উঠতে পাচ্ছি না।

— লোকজন ডেকে আনব ?

—না, না মেমসা'ব, ও চেষ্টাও করবেন না। ও আপনাকে মেরে ফেলবে।

—কিন্তু বাঘটা তো চলে গেছে, গোবিন্দ সিং!

এই বলে একবার চারদিক তাকিয়ে নিল জোয়ান।

একটু ম্লান হাসল গোবিন্দ সিং। জোয়ান কেমন করে জানবে নরখাদক বাঘ শিকার ফেলে কখনই চলে যাবে না। শিকারী গোবিন্দ সিং তার সজাগ কান দিয়ে শুনতে পাচ্ছে বাঘটার নিঃশ্বাসের শব্দ। পাশের ঝোপটায় সে ওৎ পেতে বসে আছে সুযোগের অপেক্ষায়।

—মেমসায়েব, আমার অনুরোধ,—গোবিন্দ সিংএর কণ্ঠে আকুতি,—আপনি এই মুহূর্তে নদীর কানাত দিয়ে সাবধানে চলে যান। কিছুটা গেলেই দেখবেন, ঝোপ পাতলা হয়ে গেছে।

—আবার যদি বাঘটা এসে পড়ে ?

—ফাঁকা জায়গায় ওরা বেরোয় না, মেমসা'ব!

—না, গোবিন্দ সিং, তোমাকে এভাবে ফেলে আমি যাব না।···একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বলে জোয়ান।

মেমসাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গোবিন্দ সিং-এর অন্তর ভরে গেল। সালাম জানাতে গিয়েও পারল না সে। হাতটাও তুলতে পারছে না। কব্জিটায় বেশ জোরেই লেগেছে। বাঁ-দিকের কপালটাও বেশ ফুলে উঠেছে তার।

—দোহাই আপনার মেমসায়েব। আমার কথা শুনুন। আজ সকালে বেরোবার আগে আপনার বাবা আমায় ডেকে বলেছিলেন—গোবিন্দ সিং, তোমায় আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি। জোয়ান আমার একমাত্র মেয়ে, দেখো।···না, না মেমসায়েব, মনিবের বিশ্বাস আমি ভাঙ্গতে চাই না।

গোবিন্দ সিং-এর কথাগুলো বড় অদ্ভুত লাগে জোয়ানের। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও এই বিশ্বাস, এই কর্তব্যবোধ! গলাটা ভারী হয়ে আসে জোয়ানের। পাশের ঝোপ থেকে বাঘের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের শব্দ এবার যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

—আচ্ছা, গোবিন্দ সিং, ওকে গুলী করলে হয় না ?

—বন্দুক তুলতে গেলে শক্ত কব্জির দরকার, মেমসায়েব। আমার যে কব্জিটাও ভেঙ্গে গেছে। একগাছা লাঠি তোলার শক্তিও আমার নেই। না, তা হয় না, এই বুড়োর দোহাই, আপনি চলে যান। আপনার কিছু হলে আমার মনিব বাঁচবেন না।

জোয়ান অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু গোবিন্দ সিংকে রাজী করাতে পারল না।

—বেশ, আমি যাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত জোয়ান সম্মতি জানাতে বাধ্য হল। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটল যেন গোবিন্দ সিং-এর মুখে।

—বন্দুকটাও সঙ্গে রাখুন, মেমসায়েব!

জোয়ানের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

বন্দুকটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে জোয়ান এগিয়ে চলল নদীর কিনারের দিকে। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে সবুজ অরণ্য। তারই ভিতর থেকে জ্বলজ্বলে দৃষ্টি মেলে বাঘটা দেখল জোয়ানকে।

কয়েক পা গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে জোয়ান স্তম্ভিত হয়ে গেল।

নদীর কিনারের দিকে মুখ করে তখনো তেমনি নির্ভীকচিত্তে বসে আছে গোবিন্দ সিং। আর তারই হাত কয়েক দূরে পরম নিশ্চিন্তে শিকার লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাঘটা।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। এখানকার সব পাখিও কি ভয়ে পালিয়ে গেছে! কাছে-পিঠে নিশ্চয়ই সেই কাকাড়টা এখনও আছে। কিন্তু ডাকছে না কেন? নিজের বুকের ওঠা-নামার শব্দটা যেন বড় বেশী কানে বাজছে জোয়ানের।

গোবিন্দ সিং তখন কথা বলছে বাঘটার সঙ্গে। প্রতিটি কথা তার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে জোয়ান। ওর গলার স্বর একটুও কাঁপছিল না। স্বর স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক।

গোবিন্দ সিং বলছে—আর দেরী করছিস্ কেন রে শয়তান? আয়, যেমন আরও পাঁচজনকে মেরেছিস্, তেমনি করে আমাকেও মেরে ফেল। আর কেন? তিন বছর আগে তুই-ই শয়তান আমার ভাইকে মেরেছিস্। আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোকেও বলে যাচ্ছি শয়তান, তোরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ সাহেব না নিয়ে ছাড়বেন না, দেখিস্।

যতই এসব কথা শুনছে জোয়ানের গায়ের রক্ত ততই যেন হিমশীতল হয়ে আসছে। আশ্চর্য, একজন বৃদ্ধের এত সাহস! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎমৃত্যুর সঙ্গে এত নির্ভীকভাবে যে কেউ কথা বলতে পারে, জোয়ান যেন তা কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু কেন? সে কি তাকে নিরাপদে অক্ষত দেহে চলে যাবার সুযোগ দেবার জন্যে?

বাঘটা আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। টিলাটার ওপর থেকে সে নিঃশব্দে নেমে এল। শুধু পিছন পায়ের আঁচড়ে কয়েক মুঠো ধুলো উড়ে গেল। কী করবে জোয়ান এই মুহূর্তে! কাঁধের বন্দুকটার কথাও যেন এখন আর তার মনে নেই। প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে বাঘটা। মাত্র হাত দশেকের ব্যবধান। ভয় করছে না গোবিন্দ সিং-এর! কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে গোবিন্দ সিং তাকিয়ে রয়েছে বাঘটার দিকে। বাঘটিও দেখছে গোবিন্দ সিংকে।

কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যাবার পর হঠাৎ এক দুর্জয় সাহস ফিরে পেল জোয়ান। এমন বিশ্বাসী, নির্ভীক মানুষকে সে কিছুতেই অসহায়ের মত মরতে দেবে না। প্রাণ থাকতে না।

—গোবিন্দ…গোবিন্দ…তুমি মরতে যাবে না। তোমায় বাঘের মুখে মরতে দেব না।… বলতে বলতে জোয়ান বাঘটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কী করতে যাচ্ছে সে নিজেই জানে না।

বাঘটা তার জ্বলজ্বলে দৃষ্টি তুলে একবার তাকাল জোয়ানের দিকে। তার চোখ দুটো ভয়ঙ্কর—যেন দুটো আগুনের গোলক ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে সে সমস্ত শরীরটা একবার বাঁকাল।

গোবিন্দ সিং জানে, এর অর্থ কী! পাকা শিকারী গোবিন্দ।

সরে যান, সরে যান মেমসায়েব, এখনি ও লাফাবে।…চীৎকার করে উঠল গোবিন্দ।

জোয়ান থামল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য। আবার সে নির্ভীক পায়ে এগিয়ে এল গোবিন্দ সিং-এর দিকে। সামনের পা দুটো সোজা ছড়িয়ে দিয়ে কঠিন চোখে বাঘটা তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ যে লেজটা তার ক্রুদ্ধ আক্রোশে পাথরের উপর আছড়াচ্ছিল, এখন তার ডগাটুকু শুধু একটু একটু নড়ছে। শিকারী গোবিন্দ সিং-এর বুঝতে বাকী রইল না—বাঘ তার নিশানা ঠিক করে নিয়েছে। এবার সে তীরবেগে উড়ে আসবে আর সামনের ঐ দুটো ছড়ানো থাবায় তার নিশ্চিত মৃত্যু।

গোবিন্দ সিং একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মনে হল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ যেন সেই ডোরাকাটা বাঘটা তার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, সে যেন স্পষ্ট অনুভব করল তার টান টান শক্ত মাংসপেশী। সে যেন দেখতে পেল তার হলুদ চোখ দুটো শিকারের আশায় খুশী।

আর সেই মুহূর্তেই গোবিন্দ সিং শুনল একসঙ্গে দুটো ভীষণ শব্দ আর তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদ। ভয়ে চোখ দুটো বুজে ফেলল গোবিন্দ সিং, মুখ দিয়ে বেরুল শুধু—হা ঈশ্বর!

কাশির মত ঘরঘরে শব্দ শুনে চোখ খুলে পিছন দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ সিং যা দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। বিরাটকায় নরখাদক বাঘটা কিছু দূরে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর তারই হাত কয়েক দূরে অচৈতন্য পড়ে আছে মেমসাহেব। দোনলা বন্দুকটা পড়ে আছে বাঘ আর মেমসাহেবের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। বন্দুকটার মুখ দিয়ে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

জোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গোবিন্দ সিং-এর অন্তর ভরে গেল। তার দু চোখ যেন জলে ভরে উঠল। কিন্তু ও কী! জোয়ানের দেহটা এখনও অমন নির্জীবের মত পড়ে আছে কেন?

তবে কী শয়তানটা মরার আগে মেমসাহেবকে মেরে গেল? না, না, তা কখনই হতে পারে না। দেহটা কোন রকমে পাথরের উপর দিয়ে দ্রুত টেনে নিয়ে গোবিন্দ সিং মেমসাহেবের দিকে এগিয়ে চলল। হাত কয়েক যাবার পরই দেখল মেমসাহেবের দেহটা একটু নড়ে উঠছে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল, চোখ দুটো ঘোলাটে, উদাস। ঠোঁট দুটো সজোরে চেপে ধরে কী এক অসহ্য যন্ত্রণা দমন করার চেষ্টা করছে সে। গোবিন্দ সিং সন্ধানী দৃষ্টি মেলে নিরীক্ষণ করল জোয়ানের মুখটা। না—কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই।

—মেমসায়েব···মেমসা'ব!···গোবিন্দ সিং-এর গলা যেন বুজে আসছে।

—না, আমায় লাগে নি।···কোন রকমে বলতে পারল জোয়ান।

গোবিন্দ সিং দেখতে পাচ্ছে জোয়ানের সুন্দর মুখটা যন্ত্রণায় কুচকে যাচ্ছে।

—কিন্তু, মেমসা'ব···!

—কাঁধের হাড়গুলো বোধ হয় ভেঙে গেছে। বন্দুকের গুঁতোটা—। বলে কাঁধের উপর হাতটা চেপে ধরল জোয়ান।

ওরই মধ্যে একটু যেন আশ্বস্ত হল গোবিন্দ সিং।

—তা হলে শয়তানটা আপনাকে ছুঁতে পারে নি?

—না, না। ও যখনই আমার দিকে লাফ দিয়েছে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঐ টিলাটার পাশে দাঁড়িয়ে একেবারে দুটো ট্রিগারই টিপে দিয়েছি। তখন আমার কোন হুঁস ছিল না, গোবিন্দ। বন্দুকটা যে অত জোরে পিছিয়ে এসে আমাকে এমন ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে, তা আমি ভাবতেও পারি নি।

—ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন মেমসা'ব। ঐ নরখাদক এখানকার চব্বিশ জনের রক্ত শুষেছে।

—বলছো কি গোবিন্দ? চব্বিশ জনের!

জোয়ান আর কিছু বলতে পারল না। সেই মুহূর্তে টিলার পাশে অসহায়ের মত পড়ে থাকা বিরাটকায় ডোরাকাটা নির্জীব নরখাদক বাঘটাকে তার মনে হল ঘুমন্ত এক শয়তান। *

---

* জনৈক বিদেশিনীর ডায়েরী থেকে।

কানে তুলোর দেশে

॥ শ্রীশিশির মজুমদার ॥

[মঞ্চে আধা-আলো অন্ধকার। কারণ সময়টা বিকেল। স্থান : একটি রাস্তা। আশে-পাশের বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ। ভিন্ দেশীয় এক সন্ন্যাসী ও তাঁর শিষ্য এই সময়ে ঢুকলো।]

সন্ন্যাসী ॥ ভোম্বল!

শিষ্য ॥ গুরুদেব!

সন্ন্যাসী ॥ এ কোন্ দেশে এলাম হে?

শিষ্য ॥ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না গুরুদেব!

সন্ন্যাসী ॥ কেমন এক শ্মশানপুরী বলে মনে হচ্ছে না?

শিষ্য ॥ আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী ॥ এই হলুদরঙা বিকেলে একটাও লোক দেখা যাচ্ছে না। কোথায় ছেলে-ছোকরার দল পার্কে পার্কে হৈ-হৈ করে নেচে বেড়াবে, বুড়োর দল পাইচারী করবে, লোক-জন চলবে-ফিরবে, তা নয়—যেন ঘুটঘুট্টি রাত্তিরের মতো চুপচাপ!

শিষ্য ॥ আমরা আসতে আসতে কেমন বাদুড়ের ওড়া আর শিয়ালের দৌড়োদৌড়ি দেখতে দেখতে এলাম গুরুদেব!

সন্ন্যাসী ॥ আশ্চর্য!

শিষ্য ॥ অদ্ভুত!

[এমন সময় 'টকেসের, টকেসের চাই' হাঁকতে হাঁকতে একজন ফেরিওয়ালা ঢুকবে। তার মাথায় হাঁড়ি, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, হাতে শাকের বোঝা, পিঠে একটা বস্তা, আর দু'কানে বড়ো বড়ো তুলোর পট্টি গোঁজা।]

সন্ন্যাসী ॥ ভোম্বল! মনে হচ্ছে এ ফেরিওয়ালা, একে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস কর ত।

শিষ্য ॥ এই ফেরিওয়ালা! [ফেরিওয়ালা উত্তর দেবে না। শুধু 'টকেসের' হাঁকবে। দু'-তিনবার জোরে জোরে ডাকার পরেও নয়; কিন্তু তখন—]

এ, টকেসর!

ফেরিওয়ালা ॥ টকেসেরে কি নেবে বাবাজী!

শিষ্য ॥ নেওয়ার কথা পরে। আগে বল তো দেখি এ দেশের নাম কি? এই ভরা বিকেলে রাস্তা ঘাটে কোনো লোকজন দেখছি না কেন?

[ফেরিওয়ালা শিষ্যের আপাদমস্তক দেখবে। তারপর সন্ন্যাসীর চারপাশে ঘুরে আবার তাঁর আপাদমস্তক দেখবে।]

ফেরিওয়ালা ॥ বুদ্ধি যে নাই বাবাজী! বুঝবে কিসে?

শিষ্য ॥ মানে? কি বলতে চাও?

ফেরিওয়ালা ॥ (হঠাৎ কেঁদে ফেলে) বুদ্ধিগুলান যে সব বেরিয়ে গেছেন বাবাজী! কি হবে বাবাজী?

সন্ন্যাসী ॥ আরে এ কাঁদে কেন ভোম্বল? তুমি কি বললে একে?

শিষ্য ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) আমি গুরুদেব—মানে—আমি।

ফেরিওয়ালা ॥ মানে বাবাজী কানে যে তুলো নাই গো। এ যে কানে তুলোর দেশ গো।

শিষ্য ॥ তবে কি হবে?

ফেরিওয়ালা ॥ আর কি হবেন। আমি তুলো দিচ্ছি বাবাজী। শিগগির কানে গুঁজে নাও।

[ফেরিওয়ালা তার ঝোলার ভেতর থেকে তুলো দেবে। সন্ন্যাসী ও শিষ্য অবাক হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কানে তুলো গুঁজবে।]

সন্ন্যাসী ॥ এবার বুদ্ধি থাকবে তো?

ফেরিওয়ালা ॥ থাকবে না কেন বাবাজী—থাকতে হবেকই। আমার দেশের রাজার হুকুম যে।

সন্ন্যাসী ॥ ও বুঝলাম। আচ্ছা বল তো ভাই, 'টকেসের'টা কি?

ফেরিওয়ালা ॥ টকেসের মানে হ'ল কি তুমি সব পাবে বাবাজী।

শিষ্য ॥ ভালো করে বুঝিয়ে বল ফেরিওয়ালা।

ফেরিওয়ালা ॥ বলছি, সব বলছি। আগে তোমরা তুলোগুলো ঠিকমতো গুঁজে রাখ। (উভয় কানে হাত দেবে)

হ্যাঁ, এবার বুঝবে। টকেসের হল, তিন দেশীয় তিন পয়সা। এই তিন পয়সা দিয়ে সব পাবে।

টকেসের নামরুল।
টকেসের কাঁকরুল।
টকেসের চাল,
টকেসের ডাল।

শিষ্য ॥ (উৎফুল্ল হয়ে) রসগোল্লা পাওয়া যাবে?

ফেরিওয়ালা ॥ যাবেক বাবাজী!

শিষ্য ॥ সন্দেশ?

ফেরিওয়ালা ॥ যাবেক।

শিষ্য ॥ আহা-হা! কতদিন রসগোল্লা আর সন্দেশ খাই না! গুরুদেব, কিনেই ফেলি না কিছু টকেসেরের রসগোল্লা আর সন্দেশ।

সন্ন্যাসী ॥ ভোম্বল, লোভ সংবরণ কর। এ দেশ বড়ো সুবিধের নয়। এ দেশে আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না।

শিষ্য ॥ এ কী ভয়ানক কথা বলছেন গুরুদেব! কতদিন রসগোল্লা আর সন্দেশ খাই না (জিভের জল সামলাবে।)

সন্ন্যাসী ॥ না। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

শিষ্য ॥ না, গুরুদেব! এখানে চিরকাল থাকা ঠিক। কোলকাতায় চালের কষ্ট। রসগোল্লা-সন্দেশের কষ্ট। আর এখানে দিব্যি এ সব মজার জিনিস খেয়ে নিয়ে এই মোটা শরীরটাকে আরো মোটা করব।

সন্ন্যাসী ॥ তুমি কি আমার অবাধ্য হবে ভোম্বল?

শিষ্য ॥ একটু হতে ইচ্ছে হচ্ছে গুরুদেব!

সন্ন্যাসী ॥ বেশ। আমি চললাম। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি তোমার বিপদ হবেই। সেদিন তুমি আমায় স্মরণ কোরো। (বেগে প্রস্থান)।

ফেরিওয়ালা ॥ কি বাবাজীরা! তোমরা ঝগড়া করবে—না টমেসের নেবে?

শিষ্য ॥ নেবো না মানে! নিশ্চয়ই নেবো। টমেসের রসগোল্লা দাও! টমেসের সন্দেশ, টমেসের চাল, টমেসের ডাল, টমেসের জামরুল আর—আর—টমেসের মেনচুস আছে না? বিস্কুট? দাও! দাও!

[ফেরিওয়ালা সব দেবে। শিষ্য পেটুকের মতো এটা-ওটা খাবে। মুখ ভর্তি করে খেতে খেতে কাসবে। আবার খাবে···এর মধ্যে পর্দা নেমে আসবে।]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজসভা। রাজা ও মন্ত্রী। রাজার কানে তুলো আছে—
মন্ত্রীর নেই। এঁদের মুখের ভাষা সাধু।]

রাজা ॥ মন্ত্রী! আমার রাজ্যে এত বড়ো অন্যায়, এত বড়ো অনাচার!

মন্ত্রী ॥ কি হইয়াছে মহারাজ?

রাজা ॥ এতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে কি বলিলাম? তুমি কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ? আমার রাজ্যে দেওয়াল চাপা পড়িয়া একটি বিড়াল মরিল, এত বড়ো অনাচার কি রূপে হইল?

মন্ত্রী ॥ তাই তো—কি রূপে হইল? আমার কেমন মাথা গুলাইতেছে।

রাজা ॥ মন্ত্রী! এ কী কথা শুনি তোমার মুখে? তুমি আমার মন্ত্রী। মন্ত্রণা দেওয়া তোমার কাজ—আর তুমি বলিতেছ কি রূপে হইল? মাথা গুলাইতেছে। (হঠাৎ রাজা ডুকরিয়ে উঠবেন) মন্ত্রী!

মন্ত্রী ॥ মহারাজ!

রাজা॥ সর্বনাশ হইয়াছে! মহা সর্বনাশ!

মন্ত্রী॥ (কঁকিয়ে কেঁদে উঠবে) কার সর্বনাশ হইয়াছে মহারাজ?

রাজা॥ আর কার! তোমার।

মন্ত্রী॥ আমার? (উচ্চাসন থেকে ধপ্ করে বসে পড়বে।)

রাজা॥ হ্যাঁ মন্ত্রী। তোমার কানে তুলা নাই। তাই সব বুদ্ধি বাহির হইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রী॥ কি হইবে মহারাজ? এবার আমার কি হইবে? (হাত-পা ছুঁড়বে—মাথা চাপড়াবে।)

রাজা॥ (কয়েকবার ঘুরপাক খাবেন—কানে হাত বুলোবেন, তারপর) শীঘ্র যাও। কানে তুলার পট্টি লাগাইয়া আইস।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

সেনাপতি!

সেনাপতি॥ হুকুম করুন মহারাজ!

রাজা॥ আমার রাজ্যে এত বড়ো অন্যায় যে দেয়াল চাপা পড়িয়া একটা বিড়াল মরিবে? বিড়াল মরিয়াছে কার?

সেনাপতি॥ পান্তোয়ার মহারাজা।

রাজা॥ ইহার জন্য দায়ী কে?

সেনাপতি॥ গাণ্ডু।

রাজা॥ গাণ্ডু কে?

সেনাপতি॥ আজ্ঞে, পান্তোয়ার ভীষণ বন্ধু।

রাজা॥ তবে সেই গাণ্ডুর প্রাণদণ্ড হইবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী॥ মহারাজ, আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখুন—কে দোষী! গাণ্ডু না পান্তোয়া?

রাজা॥ তাই তো মন্ত্রী, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। হুট করিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া ঠিক নয়! দেখিয়াছ মন্ত্রী তুলার কেমন গুণ!

মন্ত্রী॥ আজ্ঞে—হেঁ—হেঁ—হেঁ।

রাজা॥ এইবার তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিয়াছে—আমি নিশ্চিন্ত। ভাবিয়া ঠিক কর তো কাহার প্রাণদণ্ড হইবে?

মন্ত্রী॥ ভাবিবার কিছু নাই মহারাজ। ভাবিবার কিছুই নাই। (মাথা নাড়াতে নাড়াতে)

রাজা॥ কেন?

মন্ত্রী॥ কারণ, হয় পান্তোয়া নয় গাণ্ডু দোষী।

রাজা॥ তা তো বটেই, তা তো বটেই। তবে কে দোষী তাহা বল।

মন্ত্রী ॥ ইহা মোটেই শক্ত কাজ নয় মহারাজ! উহাদের দুইজনকেই ডাকা হোক।

রাজা ॥ বেশ। সেনাপতি, ডাক গাণ্ডু আর পাঁস্তোয়াকে।

সেনাপতি ॥ পাস্তোয়া তো দরবারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাপুস-হুপুস কাঁদিতেছে।

রাজা ॥ তাহাকে লইয়া আইস।

(সেনাপতি বেরিয়ে পাস্তোয়াকে দরবারে রেখে—আবার বেরিয়ে গেল।)

মন্ত্রী ॥ এই তোর নাম পাস্তোয়া ?

পাস্তোয়া ॥ হুজুর মা-বাপ। (কাঁদতে কাঁদতে)

মন্ত্রী ॥ চুপ কর ব্যাটা, তোর প্রাণদণ্ড হইবে।

পাস্তোয়া ॥ হুজুর মা-বাপ। হুজুর মা-বাপ। আমার আদরের তুলি দেওয়াল চাপা পড়িয়া ভেটকি মাছ হইয়াছে। হুজুর মা-বাপ।

মন্ত্রী ॥ তুলি কে ?

পাস্তোয়া ॥ আমার বিড়াল হুজুর! কী হইবে হুজুর ? আমার তুলি গেল গাণ্ডুর দেওয়ালে, আর আমি চড়িব আপনার শূলে ?

রাজা ॥ মন্ত্রী, শুনিলে ? গাণ্ডু ব্যাটাই দোষী।

(সেনাপতি ঢুকলো)

সেনাপতি ॥ গাণ্ডু হাজির মহারাজ।

রাজা ॥ এই গাণ্ডু, তোর প্রাণদণ্ড হইবে।

গাণ্ডু ॥ হায়, হায়! আমার প্রাণদণ্ড হবে হুজুর ? নিশ্চয় আমার প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু প্রভু আমার দোষটা কি ?

রাজা ॥ তুই খুনে। তোর দেওয়াল চাপা পড়িয়া পাস্তোয়ার 'তুলি' বিড়াল মরিয়াছে।

গাণ্ডু ॥ সে কি আমার দোষ প্রভু ? যে দেওয়াল বানাইয়াছে সেই তো প্রকৃত দোষী।

মন্ত্রী ॥ গাণ্ডু তো ঠিকই বলিয়াছে মহারাজ!

রাজা ॥ সেনাপতি, রাজমিস্ত্রিকে তলব দাও।

সেনাপতি ॥ সে রাজবাড়ীতেই কাজ করিতেছে। এখনই ডাকিতেছি। (ভেতর থেকে) রাজার মিস্ত্রি হাজির হো! রাজার মিস্ত্রি!

মিস্ত্রি ॥ (ভেতর থেকে) হাজির সেনাপতি মশাই, হাজির। (ছুটতে ছুটতে সেনাপতি সহ ঢুকবে।)

মন্ত্রী ॥ অ্যাই ব্যাটা, তোর প্রাণদণ্ড হইবে। তুই বিড়াল হত্যা করিয়াছিস।

মিস্ত্রি ॥ আমি ? আমি তো কোনো বিড়ালের ধারেকাছেও যাই না প্রভু। ওগুলি মেআওঁ করে, ঘাও করে, খামচি লাগায়।

মন্ত্রী ॥ তোরই দেওয়াল বানাইবার দোষে, বিড়াল চাপা পড়িল এবং মরিল।

মিস্ত্রি ॥ ও-হো এই কথা! তা প্রভু, সে দোষ তো আমার নয়—জোগালদারের।

রাজা ॥ কেন সে দোষ জোগালদারের? সে কি করিয়াছে?

মিস্ত্রি ॥ সে আমায় খারাপ জল দিয়াছিল মহারাজ। তাই তো দেয়ালের গাঁথুনি খারাপ হইয়াছে।

রাজা ॥ তবে ডাকো সেই জোগালদারকে।

মিস্ত্রি ॥ জোগালদার আমার সঙ্গেই আছে মহারাজ, এক্ষুণি লইয়া আসিতেছি ডাকিয়া। (ছুটে ভেতরে যায় তারপর হিড়হিড় করে জোগালদারকে টেনে আনে) এই-তো তোরই দোষে বিড়াল মরিয়াছে। তোর প্রাণদণ্ড হইবে।

জোগালদার ॥ আমার তো কোনো দোষ নাই গো। ভিস্তিওয়ালা সিমেন্ট-বালিতে যেমন জল দিয়াছে, আমি তেমন মিশাইয়াছি।

মন্ত্রী ॥ এটা সত্যি কথা। ভিস্তিওয়ালাই ইহার জন্য দায়ী।

রাজা ॥ তবে তাহারই প্রাণদণ্ড হইবে (ইতিমধ্যে ভিস্তিওয়ালা ব্যাপার দেখার জন্য সভায় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল) ঐ ঐ তো ভিস্তিওয়ালা! সেনাপতি ধর উহাকে। শূলে চড়াও।

ভিস্তিওয়ালা ॥ (এ কথা শুনেই পালাতে যাবে, সেনাপতি ধরবে) অ্যাঁ, আমার প্রাণদণ্ড হইবে? না, না, প্রাণদণ্ড হইবে নচ্ছার হকারের। সেই আমায় খারাপ ভিস্তি দিয়াছিল।

রাজা ॥ তবে যা, শীঘ্র যাইয়া তাহাকে লইয়া আয়। আজ আমাকে প্রাণদণ্ড দিতেই হইবে।

ভিস্তিওয়ালা ॥ এখুনি যাইতেছি প্রভু। (প্রস্থান)

রাজা ॥ মন্ত্রী, এই জঘন্য, ভয়ঙ্কর অপরাধের বিচার যেরূপেই হউক, আজই শেষ করিতে হইবে। আমার রাজ্যে এই অনাচার আর চলিবে না। বিড়ালের প্রকৃত হত্যাকারীর শূলে চড়িতে হইবে। এই আমার শেষ কথা।

গাণ্ডু ও পাণ্ডোয়া ॥ মহারাজ কি জয়! মহারাজ কি জয়!

মন্ত্রী ॥ থাম মূর্খের দল। এখন আর গোল করিস না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে দে।

ভিস্তিওয়ালা ॥ আনিয়াছি মহারাজ—আনিয়াছি। বিড়ালের খুনীকে আনিয়াছি।

মন্ত্রী ॥ অ্যাই কোতোয়াল! ইহার শূলে চড়ার ব্যবস্থা কর।

হকার ॥ (অবাক হয়ে) হে ভগবান! কার—কার শূলে চড়ার ব্যবস্থা হইবে?

মন্ত্রী ॥ ব্যাটা উল্লুক ভাল্লুক হাতির ডিম—তোর। ব্যাটা বোমপটাস। তোর জন্যই তো বিড়ালটা চাপা পড়িয়া মরিল। তুই ভিস্তিওয়ালাকে খারাপ ভিস্তি দিয়াছিস, সেইজন্যই ঠিকমত সিমেন্ট মাখিতে পারে নাই আর সেইজন্যই—

হকার ॥ প্রভু! প্রভু! থামুন। থামুন। আমার মহা সব্বনাশ হইয়াছে—মহা সব্ব—(কানে হাত দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করবে) না না. আমার সব্বনাশ হয় নাই। হুর রে. আমি বাঁচিয়া

আছি। কানে আমার তুলো ঠিকই আছে—ঠিকই আছে। (কানে হাত দিয়ে স্টেজের এ মাথা ও মাথা দৌড়বে—সেনাপতি হাত ধরে দাঁড় করাবে)

রাজা ॥ মন্ত্রী, এ ব্যাটা বড্ড ফিচকে। একে দুইটা বিছুটি পাতার চাবুক দাও। (সেনাপতি বিছুটি পাতা নিয়ে এগিয়ে মারতে যাবে আর তারই গালে লাগবে।)

সেনাপতি ॥ (একটু বাদে) হো—হো—গেলাম—গেলাম—গেলাম। (ছুটতে ছুটতে চুলকোতে চুলকোতে প্রস্থান)

রাজা ॥ বড্ড গোল হইতেছে।

মন্ত্রী ॥ আপনি কাহাকে বলিতেছেন মহারাজ? (রাজার কানে হাত দিয়ে) মহারাজ, আপনার তুলা পড়িয়া যাইতেছে।

রাজা ॥ (ঠিক করে) তাই গোলমাল হইতেছে। যাহা হউক, হকার শূলে যাও।

হকার ॥ মহারাজ! শূলে যাইবে আপনার হল্লাগাড়ীর পুলিস। ফুটপাতে দাঁড়াইয়া আমি ভিস্তি বিক্রি করিতেছিলাম। সেই পুলিস আসিয়া তাড়া দিতেই আমি খারাপ ভিস্তি দিয়া পলাইয়া গিয়াছি।

রাজা ॥ তাই তো মন্ত্রী! আমারই হল্লাগাড়ীর পুলিসের এতদূর আস্পর্ধা। (দাঁত কড়মড় করে) হল্লাগাড়ীর পুলিসকে এখনই শূলে চড়াইয়া দাও।

সেনাপতি ॥ (ছুটতে ছুটতে ঢুকে) মহারাজ! সে তো অসুস্থ। আর অসুস্থ লোকের তো শূলে চড়িবার নিয়ম নাই।

মন্ত্রী ॥ হক্ কথা মহারাজ! তবে এক কাজ করা যায়। হল্লাগাড়ীর পুলিসের মতো মোটাসোটা নাদুসনুদুস কাহাকেও শূলে চড়াইলে হয়।

রাজা ॥ তবে খুঁজিতে হয় ভিন্‌দেশী কে আছে।

সেনাপতি ॥ আছে মহারাজ! একজন মোটাসোটা লোককে আমি দেখিয়াছি। একবার বাহিরে গিয়া দেখিতেছি। (প্রস্থান)

[সকলে চিন্তিতমনে স্টেজের উপর পায়চারী করতে থাকবে। মিনিটখানেক পর সেনাপতি হন্তদন্ত হয়ে শিষ্য ভোম্বলকে নিয়ে ঢুকবে। সেই সময় অপেক্ষমান সকলে "জয় কানে তুলো দেশের জয়! জয় মহারাজের জয়!" ধ্বনি তুলবে।]

রাজা ॥ ঢেঁড়াদার! ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও, "বিড়াল দেয়ালে চাপা পড়িয়া মরা অপরাধে কানে তুলো দেশের মহারাজার হুকুমে হল্লাগাড়ীর পুলিসের অভাবে তাহারই মতো মোটাসোটা কোঁদা এক ভিন্‌দেশীকে শূলে দেওয়া হইল।"

[ঢেঁড়াদার ঢেঁড়া বাজাতে বাজাতে চলে যাবে।]

শিষ্য ॥ হে গুরুদেব! আপনার কথাই সত্যি হ'ল। অতি লোভে আমি মরতে চললাম। আমাকে

দয়া করুন, আমাকে রক্ষা করুন। (বলতে বলতে কেঁদে ফেলবে) হে প্রভু! আপনি না বলেছিলেন, বিপদের দিনে আসবেন—কই, এবার আসুন। আমায় শূলের থেকে কূলে তুলুন। গুরুদেব—গুরুদেব!

[সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

সন্ন্যাসী ॥ জয় মহারাজের জয়! জয় কানে তুলো দেশের জয়!

মহারাজ ও মন্ত্রী ॥ কে? কে?

সন্ন্যাসী ॥ আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। শিষ্যর কান্না শুনে ছুটে এসেছি। কিন্তু মহারাজ, এই অবোধ বালককে শূলে না তুলে আপনার উচিত আমায় শূলে তোলা।

মন্ত্রী ॥ তোমার এত দরদ উথলিয়া উঠিল কেন হে সন্ন্যাসী ঠাকুর?

সন্ন্যাসী ॥ কারণ যে খুব সাধারণ নয় মন্ত্রী মশাই! এই পৃথিবীতে আমি আগে জন্মেছি, অনেক বিচরণ করেছি। এবার এই ছোটদের সুযোগ দেওয়া দরকার। তা ছাড়া, এই সময়টাই শূলে চড়বার পক্ষে ভালো সময়।

রাজা ॥ কেন?

সন্ন্যাসী ॥ কারণ, এই সময় শূলে চড়লে সোজা স্বর্গে যাওয়া যাবে—এটা যে মাহেন্দ্রক্ষণ, পরম শুভ সময়। যাহোক, মহারাজ, আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি এখনই শূলে উঠব।

মন্ত্রী ॥ খবরদার সন্ন্যাসী! আমি বুড়া মানুষ, আমি আগে স্বর্গে যাইব।

সেনাপতি ॥ তাহাতে হইয়াছে কি? আমি যুবক মানুষ, আমিই আগে শূলে যাইব।

রাজা ॥ চোপরাও, চোপরাও তোমরা। আমি এ রাজ্যের রাজা। সকলের আগে আমি শূলে চড়িব। আমি স্বর্গে যাইব।

মন্ত্রী ও সেনাপতি ॥ না, না।

রাজা ॥ হ্যাঁ।

মন্ত্রী ॥ না, না।

রাজা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোতোয়াল! কোতোয়াল! (ডাকতে ডাকতে বেগে প্রস্থান। পরে, মন্ত্রী ও সেনাপতি তারপর অন্যান্যরা হৈ-চৈ করতে করতে প্রস্থান)

সন্ন্যাসী ॥ যেমন রাজ্য, তেমনি তার রাজা।
টকেসের খাদ্য, টকেসের সাজা ॥

সন্ন্যাসী ও শিষ্য ॥ জয় কানে তুলোর দেশের জয়! জয় কানে তুলোর দেশের জয়!!

[পর্দা নেমে আসবে]

ক্ষমা চাই না

॥ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ভোরের ঠিক এই সময়টায় রোজ ঘুম ভেঙ্গে যায়। মাঠের ও-পাশের সেলে তখন রুস্তমজী নমাজ পড়ে। শোভা সিংও আর চুপ করে বসে থাকে না, বিছানা ছেড়ে উঠে বসে চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আপন মনে বিড়-বিড় করে শিবস্তোত্র পাঠ করে : “চন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর পাহি মাম্”, দু'হাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়। এক অপূর্ব শান্তিতে সারা মন যেন ভরে যায়। কিছুক্ষণ আবার চোখ বুজে থাকে। এই সময়টায় জানাশোনা অনেকের কথা মনে পড়ে, এখন কোথায় তারা ? কেউই হয়ত বেঁচে নেই, সব শহীদ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—গোয়ালিয়রের রাম সিং, দিল্লীর আহমদ উল্লা, ফকরুদ্দিন, রুস্তম বেগ, ঝাঁসীর রাণীজী। শোভা সিং রাণীজীর কথা স্মরণ করে আবার দু'হাত কপালে ঠেকাল, মনে হোল সেলের এই জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে দুটো ধারাল তলোয়ার তার চোখের সামনে যেন ঝল্মল্ করে উঠল আর সেই তেজোময় আলোয় শোভা সিংএর দু'চোখ যেন ঝল্সে গেল—চারিধারে বারুদের আগুন আর গোলাগুলির বিকট আওয়াজ, তারই মধ্যে গদর ফৌজ উল্লাসে চীৎকার করছে। দেবী দুর্গা স্বয়ং যেন রণে নেমেছেন, সেই ত্রিনয়নী, দু'হাতে অসি, দনুজদলনী। ঝাঁসীর কেল্লা দখল করতে এসে ফিরিঙ্গী ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ওরা বিশ্বাসই করতে পারছে না, সামনে এ কাকে দেখছে তারা! ঘোড়ার পিঠে কুইন রোডেসিয়া, না জোয়ান অব আর্ক! হাউ চার্মিং, হাউ ওয়াণ্ডারফুল! একটা নেটিভ গার্ল বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে! শোভা সিংএর সামনে লাফিয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন স্কট ত অবাক! হাতের পিস্তলটার কথা ছোকরা সাহেব একেবারে ভুলে গেল। ক্যাপ্টেন স্কটের সেই বিস্ময়মাখা ছিন্নমুণ্ডটা এখনও শোভা সিংএর মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়—হাউ ওয়াণ্ডারফুল!

আবছা অন্ধকারে শোভা সিং কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, দু'চোখ বন্ধ, আপন মনে বিড়-বিড় করে কি যেন বলতে লাগল, তারপর হঠাৎ রুগ্‌ণ পা দুটো সোজা করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে কাকে যেন সেলাম জানাল, একেবারে পাকা ফৌজী কায়দায়—গুলাম হাজির হুজুর! সেলাম! শোভা সিং যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ঘরের ঘুলঘুলিটার নিচে জমাট অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো মুখ একসাথে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কুচের কায়দায় তারা পর পর দাঁড়িয়ে তার সামনে। এরা রোজই আসে ঠিক এই সময়টায় তারপর অন্ধকার ফিকে হবার সাথে সাথে আবার মিলিয়ে যায়—চিনতে ভুল হয় না—দুনধুপন্থ নানা সাহেব, পাণ্ডুরং তাঁতিয়া টোপীজী, কানপুরের আফজল বেগ, লখ্‌নৌর আলী জাঁহা, দিল্লীর শাহজাদা ফিরোজ শাহ, তারপর সকলের আগে আর একজন এসে পড়েন—হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহ আলম বাহাদুর শাহ, অশীতিপর বৃদ্ধ, চৌপায়ায় বসে, চারিধারে ফিরিঙ্গী সিপাইর পাহারা। শোভা সিং এমন সময় চীৎকার করে ওঠে, “বন্দেগী জনাব, তোমার গোলামের হাজারো কুর্নিশ।” শোভা সিং দেখল, ওদের সকলের চোখেই

সেই এক জ্বলন্ত দৃষ্টি, চোখগুলো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে—ফিরিঙ্গী জামানা মুর্দাবাদ, হিন্দুস্তান অমর রহে—এমন সময় নানা সাহেবের হাতের বন্দুকটা কানের পাশে হঠাৎ যেন গর্জে উঠল, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। মেজর উইলসন ত অবাক, একজন নেটিভ কি করে এত ভাল বন্দুক চালাতে পারে। দেখছো প্রত্যেকটা গুলি একই নিশানায় গিয়ে লাগছে, এক্‌সেলেন্ট গ্রুপিং—চুম্বকের মত, হাউ ফিউরিয়াস, সামথিং স্ট্রেঞ্জ! দেখি তোমার রাইফেলটা, মেজর সাহেব নানার হাত থেকে রাইফেলটা প্রায় ছিনিয়েই নিল, দেশী রাইফেলটা খুলে ভাল করে পরীক্ষা করল, মনে মনে ওজন করল হাতের তালুতে দুলিয়ে, তারপর রাইফেলটার ওপরে কি যেন পড়ল। সাহেবের মুখ গম্ভীর, লতাপাতার চমৎকার নকশার মধ্যে ফারসীতে লেখা—মেড ইন হিন্দুস্তান! মেজর উইলসন দমবার পাত্র নন—প্রশ্ন করলেন, দেখি তোমার হাতের টোটাগুলো, ওগুলো নিশ্চয়ই ফরেন মেড, না হলে এমন অ্যাকুরেট ফায়ার কেমন করে হবে?···একটা টোটা বুটের তলায় রেখে ভাঙলেন মেজর, তারপর টোটার কাল বারুদগুলোকে হাতের তালুতে রেখে দু আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সেগুলোকে। মিহি করে গুঁড়ান সল্টপিটার, কোম্পানীর গান পাউডারের চাইতে অনেক বেশী রিফাইণ্ড। মেজর এবার সত্যই চমকে উঠলেন—এ মাল তোমরা পেলে কোথায় নানা? নিশ্চয়ই রাশিয়া থেকে আমদানি করেছ, এ কোয়ালিটি ত হিন্দুস্তানে পাওয়া যায় না!···মেজর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার তাকালেন নানা সাহেবের দিকে। নানা এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন, এবার ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—এ টোটাও মেড ইন হিন্দুস্তান সাহেব। ওটা মুঙ্গেরের সল্টপিটার, বিদেশী জিনিস আমরা স্পর্শ করি না। সাহেব এবার যেন আবার চমকে উঠলেন, একটা নেটিভের মুখে এত বড় কথা! নেটিভ প্রিন্স কোথায় নাচ-গান-হল্লা-তামাসা করে সময় কাটাবে—না লোকটা বারুদ-বন্দুক নিয়ে মাথা ঘামায়, বিলাতী কায়দায় ফৌজকে কুচকাওয়াজ শেখায়! মেজর উইলসনের ছিপছিপে দেহটা এবার যেন বেতের মত সোজা হয়ে উঠল, মখমলের আরাম-কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মেজর উইলসন চীৎকার করে উঠলেন—আপনি খবর লুকোচ্ছেন নানা, ইউ আর সাপ্রেসিং ফ্যাক্টস্! এগুলো যে আপনারা রাশিয়া থেকে আমদানি করেন নি, তার প্রমাণ কোথায়?

নানা সাহেব এবার যেন জ্বলে উঠলেন, ফিরিঙ্গী সয়তান কথার ইজ্জত বোঝে না। নানা উত্তর দিলেন, আপনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন মেজর। আপনার এই কথার আমি উচিত শিক্ষাই দিতাম, কিন্তু আজ আপনি আমার অতিথি, আপনার অসম্মান আমি করতে চাই না—

গোরা সাহেব এবার যেন লাফিয়ে উঠলেন—হোয়াট্ ডিসঅনার! আমি কোম্পানীর প্রতিনিধি, আপনার ঔদ্ধত্য ত কম নয় নানা, কথা ফিরিয়ে নিন, নইলে···

—নইলে আপনি যা খুশী করতে পারেন—মেজর উইলসন নানা সাহেবের মুখ থেকে যেন এমনি কথাই শুনতে চাইছিলেন, আর দেরী নয়, এই খবরটার জন্য কোম্পানী অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিল, টাকাও ছড়িয়েছে দেদার কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি, আজ সাক্ষী, মাল সব হাতেনাতে

পাওয়া গেছে। জাহাজ ছাড়তে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। এর মধ্যে খবরটা যদি ডেসপ্যাচে কলকাতায় পৌঁছে দেওয়া যায়—নানা ইজ এ সাস্‌পিসাস ক্যারেক্টার. এ ডেনজারাস ফায়ারব্রাণ্ড!

শোভা সিং এবার যেন আপন মনেই হেসে উঠল, মেজর উইলসনের মিথ্যা ডেসপ্যাচ, তিন দিন পরে কানপুরের গঙ্গায় জেলেরা শুশুক বলে যেটাকে জালে টেনে তুলল সেটা মেজর উইলসনের লাস, জল খেয়ে লাসটা যেন একটা সাদা খড়ির পাহাড়, কান নেই, চোখের মধ্যে গভীর দুটো গর্ত।

নানা এখন কোথায়?—নটোরিয়াস নানাকে খুঁজতে কোম্পানী কোথায়ও বাদ দেয় নি। এমন কি অমরনাথে পর্যন্ত চর পাঠিয়েছে, সন্ন্যাসী হয়ে নানা যদি ওদিকে চলে গিয়ে থাকে! আগের রাত্রে খানা দিতে এসে লঙ্গরওয়ালা ঠাকুর সিং ত সোজাই বলল, জান ওস্তাদজী, গোলমাল শুনতে পাচ্ছ? শোভা সিং প্রশ্ন করল, কিসের গণ্ডগোল?…ও জান না বুঝি, কোম্পানী যেখানে যত সাধু আর ফকির দেখছে সব ধরে ধরে হাজতে পুরছে। দাড়ি থাকলে আর রক্ষে নেই, দুজন গোরা চেপে ধরবে আর কোম্পানীর নাপিত ঘচ্‌ঘচ্‌ করে কামিয়ে দেবে দাড়িগোপ, তারপর আর একজন এসে ফিতে দিয়ে মেপে দেখবে চোখ, মুখ, নাক—নানার ছবির সঙ্গে কোথায়ও কোন মিল পাওয়া যায় কিনা, তারপর ছাড়া পেলে দু টাকা বকশিশ, আর একটা পাঞ্জা, যাতে আর কেউ আবার না ধরে। এ বন্দোবস্ত কোম্পানীই করেছে।…কথাগুলো বলে ঠাকুর সিং একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শোভা সিংএর দিকে তাকাল, শোভা সিংএর মুখের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় কিনা। শোভা সিং নির্বিকার। মৈথিলী ব্রাহ্মণ ঠাকুর সিং আবার কথা পাড়ল, হাতে খৈনী টিপতে টিপতে – নানা আওতার লোক, নানাকে গিরেপ্তার করা মুশকিল আছে। নানা নাকি যাদুভি জানে, হাতে এক তুড়িতে যে কোন বেশ ধারণ করতে পারে। শোভা সিংএর কাছ থেকে এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ঠাকুর সিং দেখল সুবিধে হবে না, শোভা সিংএর আহার শেষ হতেই লোটা আর বর্তন নিয়ে সে অন্ধকারে সরে পড়ল।

নিমকহারাম ঠাকুর সিং শোভা সিংএর মনে সেই পুরানো প্রশ্নটা আবার জাগিয়ে দিয়ে গেল, বুকের মধ্যকার পুরানো ক্ষতটা নুনের ছিটেয় আবার যেন জ্বালা করে উঠল। সত্যই ত নানা এখন কোথায়? বুড়া ভিস্তিওয়ালার মেয়ে আমিনা একদিন ঘর ঝাড়ু দিতে জানিয়েছিল, জান চাচাজী, বাপজান তোমায় জানাতে বলেছে, নানা হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে গেছে, সেই নেপালের দিকে, হিন্দুস্থানের ওপারে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে, ফিরিঙ্গীর নজর আর খবরদারীর বাইরে। সেখানে নয়া ফৌজ তৈয়ারি চলছে, তারপর নানা একদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে কোম্পানীর ওপর। কোম্পানী তার ডেরাডাণ্ডা নিয়ে হটে যাবে হিন্দুস্থান থেকে।…ছোট মেয়েটার কথাগুলো মনে পড়তে শোভা সিংএর চোখ দুটো যেন সজল হয়ে উঠল। আজ এই সময় শোভা সিং যদি নানার কাছে একবার থাকতে পেত। হাত দুটো যেন নিস্‌পিস্‌ করে উঠল, রুগ্‌ণ পা দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। সারা দেহে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, চোখ বুজল শোভা সিং। তারপর আবছা অন্ধকারে শিকল-বাঁধা দু হাত তুলে

কপালে ঠেকাল—নানা সাহেব, নানাজী, তোমায় এই গোলামের হাজারো সেলাম। আমরা তৈয়ার, আমরা চিরকাল বেঁচে থাকব তোমার আসার পথ চেয়ে।···শোভা সিং দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। বুকের মধ্যকার হাপরটা যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে। চারিদিক অন্ধকার।

গট্ গট্ গট্···ভারী বুটের আওয়াজ আর তার সাথে মশালের জোরালো আলো। বাঁধানো চত্তরের ওপর দিয়ে শব্দটা যেন এই দিকেই আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। শোভা সিং কান পাতল, হ্যাঁ, এই দিকেই ত আসছে শব্দটা তার সেলের দিকে। সেলের লোহার ভারী কপাটটার ফাঁক দিয়ে সে একবার বাইরে তাকাল—যা দেখল তাতে শোভা সিংএর আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। মাঝে মেজর গ্রীন, দুপাশে দু'জন গোরা সেপাই, আগে আগে মশালচী আলো দেখিয়ে নিয়ে আসছে। মেজরের হাতে একটা মোড়া সাদা কাগজ, পেছনে মুর্দাফরাস, তার বগলে ভাঁজ করা শোভা সিংএর জন্য কাল কুর্তা। কপাটের ফাঁক দিয়ে গীতা পড়ানর রোগা পণ্ডিতটাকে দেখা গেল না, পিছনে আসছে বোধ হয়। এই মুহূর্তে শোভা সিংএর মনে হোল তার শরীরে আর যেন কোনও জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, পচা ঘায়ের পোকাগুলোও যেন বুঝতে পেরেছে একটু বাদেই আগুনের সাথে ওরাও সব শেষ হয়ে যাবে। বহুকাল বাদে শোভা সিং আবার যেন তার দেহে একশ' হাতীর বল ফিরে পেল, নিজের শক্তিতেই উঠে দাঁড়াল এবার, সারা মন-প্রাণ জুড়ে এক অব্যক্ত প্রশান্তি। বহু বহুকাল বাদে, শোভা সিং উল্লাসে চীৎকার করে উঠল—হিন্দুস্থান

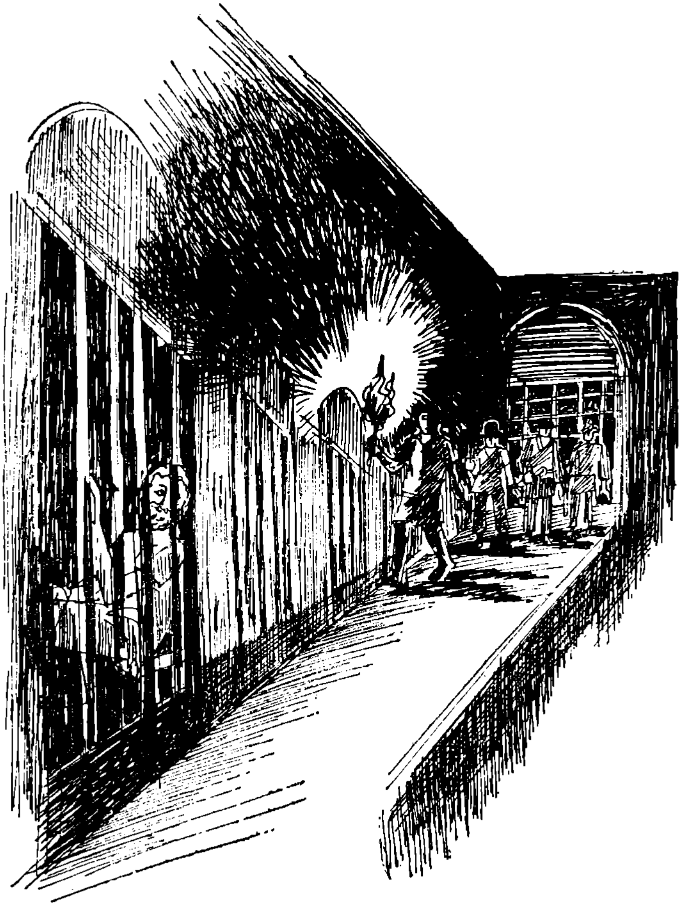

জিন্দাবাদ, নানা সাহেব অমর রহে—কোম্পানী জামানা খতম করো···হর, হর, মহাদেব···বম্···। ওপাশের সেলগুলো থেকেও প্রতিধ্বনি শোনা গেল—কোম্পানী সরকার খতম করো, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ···। উল্লাসে একসাথে চীৎকার করছে···রুস্তমজী, খলিল সেখ, রামসুভগ সিং।

শোভা সিং চোখ বুজল। মনে হোল, ও পাশের অন্ধকার থেকে অনেকগুলো হাত তাকে যেন কাছে ডেকে নিচ্ছে, ঐ ত রাম সিং, নূর আলী, রাণী সাহেবা! সেলাম রাণীজী! ম্যায় তৈয়ার হুঁ মাতাজী, আপন মনে বিড়-বিড় করে বলে উঠল শোভা সিং—টোপী সাহেব, ফিরিঙ্গীর কাছে সিডিসাস টোপী, টোপীর কথায় যাদু আছে, সারে হিন্দুস্থানের আদমীকে ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে—শহীদের রক্ত আর কোরবাণী কখনও বিফল হয় না। হিন্দুস্থানের ঘুম একদিন ভাঙবেই। দেশের প্রতিটি মানুষ তখন চিনে ফেলবে ইংরেজদের। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে গদর ওস্তাদদের এই শেষ বাণী···শোভা সিং ফৌজী কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়াল, নিগা সিধা··· বাইরে কপাট খোলার শব্দ। ভারী তালাটা অনেকদিন পরে আচমকা ঝন্ঝন্ করে বেজে উঠল।

মেজর গ্রীন সেলের মধ্যে এলেন না। শোভা সিং হিংস্র চিতাবাঘের মত অন্ধকারে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব লোহার কপাটটা খুলে গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মশালের আলোয় গুটান সাদা কাগজটা দু' হাতে খুলে মশালের আলোয় পাঠ করতে লাগলেন :

···হার ম্যাজেস্টির ইস্তাহারনামা, ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ সাল—হাবিলদার শোভা সিং, নং ৭৩২১, নেটিভ আর্টিলারী, সেকেণ্ড ক্যাভেলরী, কানপুর,—মহারাণী তোমার ফাঁসির হুকুম মকুব করেছেন। তুমি মুক্ত, এখন থেকে তুমি তাঁর রাজত্বের প্রজা। তুমি ইচ্ছা করলে হার ম্যাজেস্টির অ্যার্মিতে আবার ফিরে আসতে পার। তোমার পুরানো ভিল্লা আবার ফিরে পাবে। বাকী বকেয়া তলব যা আছে সব মিটিয়ে দেওয়া হবে—আজ সকাল সাতটায় ময়দানে দরবার হবে। আশা করি তুমি সেখানে উপস্থিত থাকবে···

মেজর গ্রীন এবার গরাদ খুলে মশালের আলোয় শোভা সিংএর দিকে হাত বাড়ালেন, তারপর শোভা সিংএর নিস্তেজ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে দুবার ঝাঁকুনি দিলেন—গুডমর্ণিং জমাদার, উইস ইয়োর গুড লাক।···মশালের আলোয় শোভা সিং অনেকদিন পরে লক্ষ্য করল, আজ সাহেবের কাছে কোনও হাতিয়ার নেই। মেজর গ্রীন বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না, কর্তব্য পালন করতে দলবল নিয়ে অন্য সেলের দিকে চললেন। আবার সেই গটঘট্ গটঘট্ শব্দ···।

অনেক, অনেকদিন পরে সেলের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে শোভা সিং আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল। পিছনে কিসের গোলমাল, গদর দলের সকলেই মুক্তি পেয়েছে যে, তাই এত হট্টগোল। ওরা সব এই দিকেই আসছে, আজ এই মুহূর্তে নিজের ওপর কেমন যেন একটা ধিক্কার এসে গেল শোভা সিংএর। এ জীবন ত ও কোনদিনই চায়নি, সিপাহীর সম্মান তার মৃত্যুতে, শহীদ হবার

আনন্দে। আবার পিছনে চাইল শোভা সিং, কিসের আগুন আর হট্টগোল, পোড়া কাপড়ের গন্ধ চারিধারে, ফাঁসির জন্য তৈরী করা কাল কুর্তাগুলোয় ওরা আনন্দে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ সাল, সকাল ৯টা, ব্যারাকপুরের ছাউনী মাঠে মহারাণীর ইস্তাহারনামা পাঠ করা হোল। পুরানো গদর সিপাহীদের কাছে অনুরোধ জানান হোল, সরকারের পক্ষ থেকে—তোমরা আবার নিজ নিজ ফৌজে ফিরে আসতে পার, আগের যার যা ভিল্লা ছিল সব আবার ফিরে পাবে, কালাপানির ওপারে যাবার সব খরচ সরকার দেবেন, আর গ্রীজ কার্তুজ···

শোভা সিং আর রুস্তম আলী একধারে বসে শুনছিল, এবার দুজনেই এক সাথে প্রতিবাদ করে উঠল,—ও কথা ফিরিয়ে নাও সাহেব, ওটা তোমাদের নিছক বানান, দরিয়া পারে যাবার জন্যে আমরা বেশী তলব চেয়েছিলুম, তোমরা তার অছিলায় চাবুক মারলে, ব্যারাকে গুলি চালালে—বাইরে জানালে আমরা কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছি··· ।

মেজর গ্রীন এবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তোমরা আবার মিউটিনি করছ, এক সাথে সব কথা বলছ, আর্মি রুল···

রুস্তম আলী এবার জ্বলে উঠল—আমরা এখন আর তোমাদের সিপাহী নয় সাহেব। তোমাদের ঐ নোংরা ফৌজী কানুন আর আমাদের জন্য নয়। ভদ্রভাবে কথা বলো সাহেব, মত প্রকাশের অধিকার সকলকারই আছে।

জোঁকের মুখে যেন লবণের ছিটে পড়ল। মেজর গ্রীন কিছুক্ষণ চুপচাপ, শোভা সিং আর রুস্তম আলী, ওরা একধারে বসে কি সব যেন আলোচনা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মেজর গ্রীনের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, স্বরটা এবার একটু মোলায়েম—দেশে ফিরে গিয়ে কি আর করবে তোমরা, পেট চলবে কিসে? কিছু কি আর আছে দেশে? এখানে তোফা আরামে থাকবে, তলবও বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। কোন কাজ নেই, কেবল ছোকরা রংরুটদের খবরদারী করা—

শোভা সিং অনেকদিন পরে এবার সত্যই হেসে উঠল—আমাদের পুতলী বানিয়ে, সং সাজিয়ে রাখতে চাও সাহেব? গোলামী আমরা আর করব না। আমরা জমি চাষ করব, মেহনত করে জমিতে সোনা ফলাব। সারাদিন ক্ষেতে খামারে কাজ করব, আর সন্ধ্যায় কাজের পরে, ছেলে-নাতিদের কাছে তোমাদের কাহিনী শোনাব। এইভাবে আমাদের গদরদলের সত্যিকারের কাহিনী একদিন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, দেশের মানুষ তোমাদের চিনতে পারবে চিরদিনের মত।···

মেজর গ্রীনের এবার সত্যই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। লাল মুখটা সিঁদুরের মত হয়ে উঠল। পাগলের মত চীৎকার করে উঠলেন বেঙ্গল আর্মির মেজর গ্রীন—চোপরাও শুয়ার কাঁহাকা! কালা আদমীর এত সাহস, মুখে মুখে উত্তর দেয়, চোপা করে—কমপ্লিট নন্-কো-অপারেশন!······

সাহেবের কথায় ওরা ভ্রূক্ষেপও করল না। পে নায়েকের কাছ থেকে নিজেদের বাকী বকেয়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিল। তারপর পুরানা কুর্তা ছেড়ে নতুন পোশাক গায়ে চাপাল। মুখে কোনও

কথা নেই। তিনজনে ব্যার: পুরের ফেরীঘাটের রাস্তা ধরল, নৌকা ধরে সোজা ফরাসী চন্দননগর। উজানের নৌকা চন্দননগরের কুঠীঘাটে গিয়ে যখন ভিড়ল তখন প্রায় বেলা ১টা। ঘাটের পৈঠায় বসে গঙ্গার জলে ছাতু মেখে, লঙ্কা আর গুড় দিয়ে ওরা মধ্যাহ্নের আহার শেষ করল।

এবার বিদায়ের পালা। শোভা সিং চলল তরাইএর দিকে—সোজা গোরক্ষপুর হয়ে নানা সাহেবের কাছে পৌঁছান চাই। সেখানে নানার সাথে আছেন বালা সাহেব, বেগম হজরত মহল আর দু হাজারী ফৌজ। রুস্তমজী আর রামস্বভগ সিং চলল রাজপুতানার দিকে—তাঁতীয়া টোপী, রাও সাহেব আর শাহজাদা ফিরোজ শাহএর সাথে তখনও কোম্পানীর যুদ্ধ চলছে সেখানে। বিদায়ের আগে ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। মুখে কোন কথা নেই, চোখে জল, ভাই সাহেব, আবার আমাদের মোলাকাৎ হবে···।

শীতের নিস্তব্ধ গঙ্গার তীর ধরে তিনটে মূর্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

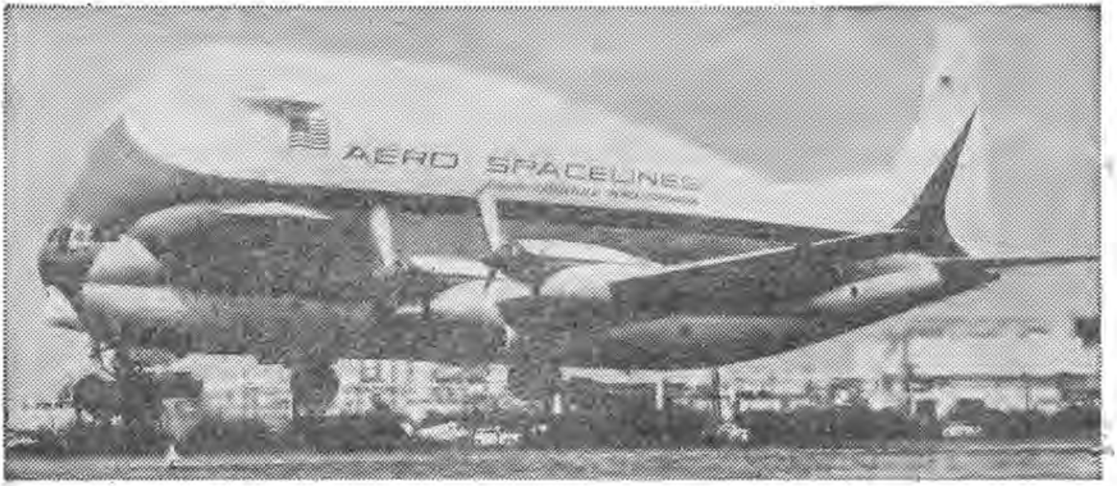

বিশ্বের বৃহত্তম বিমান—পৃথিবীর বৃহত্তম বিমানটি ক্যালিফোর্ণিয়ার ভ্যান নুইস রানওয়ে ছেড়ে আকাশে উঠছে। চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর জন্য যে স্যাটার্ণ—৫ রকেট নির্মিত হয়েছে তা এত বিশাল যে ক্যালিফোর্ণিয়ার কারখানা থেকে ফ্লোরিডায় কেপ কেনেডিতে উৎক্ষেপণ-ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া কোন সাধারণ বিমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই বিমানটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সুপার গাপ্পি'। এই বিমানের মাল রাখবার জায়গার আয়তন সাধারণ মালবাহী বিমানের পাঁচগুণ।

উত্তরাধিকার (২)

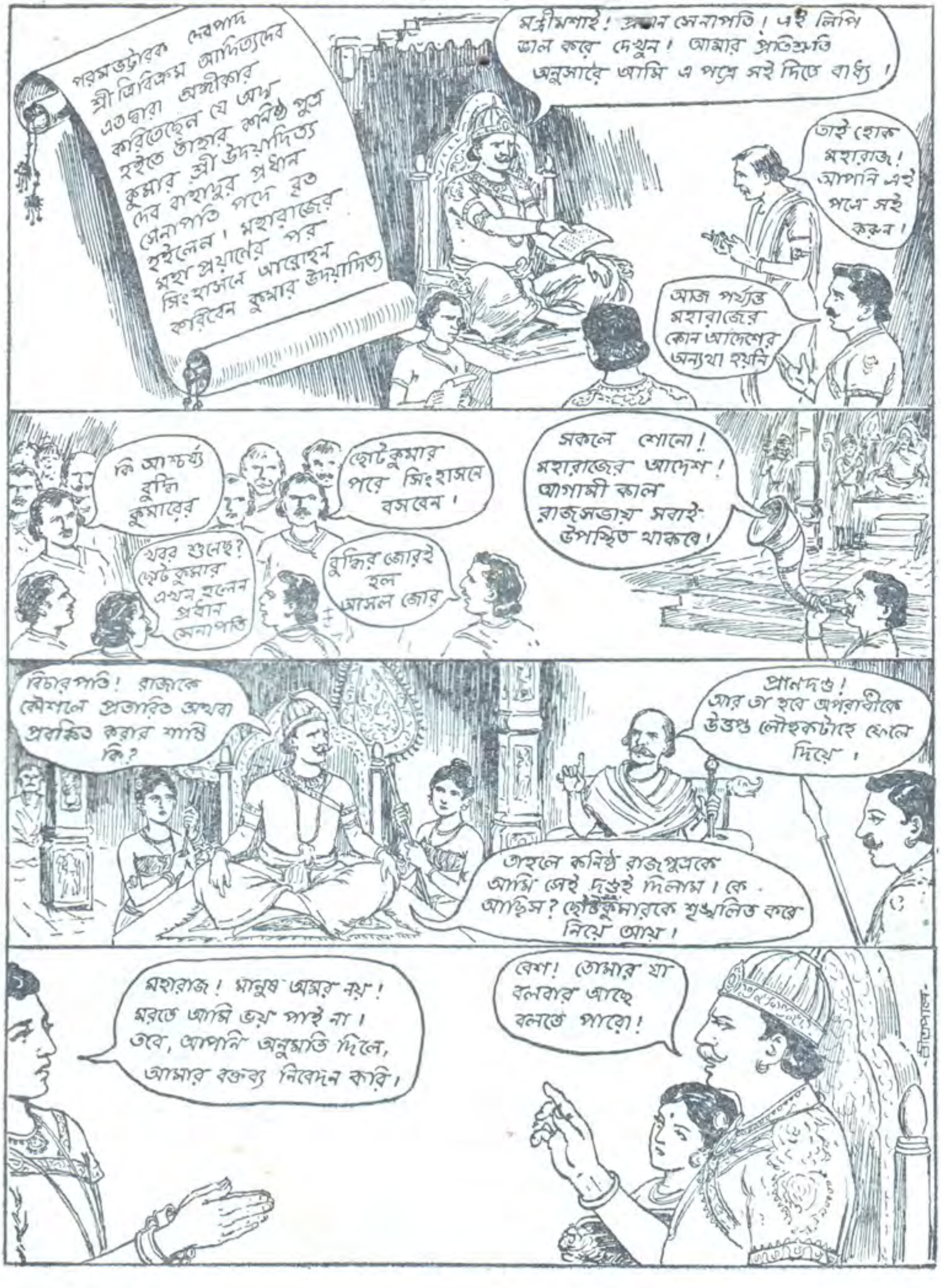
পরমভট্টারক দেবপাদ শ্রী ত্রিবিক্রম আদিত্যদেব এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছেন যে অদ্য হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রী উদয়াদিত্য দেব বাহাদুর প্রধান সেনাপতি পদে বৃত হইলেন। মহারাজের মহা প্রয়ানের পর সিংহাসনে আরোহন করিবেন কুমার উদয়াদিত্য
মন্ত্রীমশাই! প্রধান সেনাপতি! এই লিপি ভাল করে দেখুন! আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি এ পত্রে সই দিতে বাধ্য!
তাই হোক মহারাজ! আপনি এই পত্রে সই করুন!
আজ পর্য্যন্ত মহারাজের কোন আদেশের অন্যথা হয়নি
কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি কুমারের
ছোটকুমার পরে সিংহাসনে বসবেন।
খবর শুনেছ? ছোটকুমার এখন হলেন প্রধান সেনাপতি
বুদ্ধির জোরই হল আসল জোর
সকলে শোনো! মহারাজের আদেশ! আগামী কাল রাজসভায় সবাই উপস্থিত থাকবে।
বিচারপতি! রাজাকে কৌশলে প্রতারিত অথবা প্রবঞ্চিত করার শাস্তি কি?
প্রানদণ্ড! আর তা হবে অপরাধীকে উত্তপ্ত লৌহকটাহে ফেলে দিয়ে।
তাহলে কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে আমি সেই দণ্ডই দিলাম। কে আছিস? ছোটকুমারকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আয়।
মহারাজ! মানুষ অমর নয়! মরতে আমি ভয় পাই না। তবে, আপনি অনুমতি দিলে, আমার বক্তব্য নিবেদন করি।
বেশ! তোমার যা বলবার আছে বলতে পারো!

ছড়া

ছড়া

॥ অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

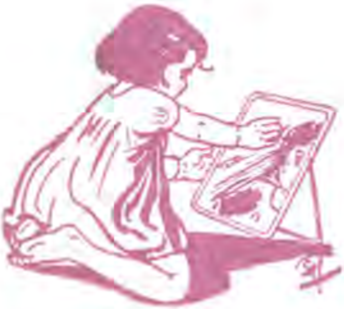

খুকীর মত একটা খুকী
আয়নাতে দেয় উঁকিঝুঁকি,
ধরতে তাকে হাত বাড়ায়,
আয়নাটাকে খুব নাড়ায়।

যতই করে নাড়াচাড়া
তবু তাকে যায় না ধরা,
উল্‌টে দিল আয়না যেই
সেই খুকীটা আর তো নেই।

চড়ুইয়ের সাজা

॥ বরেন রায় ॥

ছাতার তলে চড়ুইপাখীর
ছোট্টো দোকান ঘর,
তারি মাঝে ভরে আছে
টাট্‌কা দুধের সর।

কোন ফাঁকেতে বেড়াল মশাই
চুপ্‌টি করে এসে
ল্যাঙ্‌ মেরে ওই চড়ুইটারে
ফেল্‌লো কাদায় শেষে।

চড়ুই ভায়া দাওয়াই খেয়ে
জান্‌ নিয়ে তাই ওড়ে,
বেড়াল মশাই মালিক সেজে
বসেন দোকান ঘরে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ॥

(গ্রাঃ নং ১৭৬৬১)

১৫ই অগস্ট ভারতের স্বাধীনতার জন্মদিন। ঐ দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ঋষি অরবিন্দেরও আবির্ভাব হয়েছিল একথা ভুললে চলবে না। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতের জন্মদিনের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার জন্মদিনের এই মিলটা বেশ আশ্চর্যজনক বটে। যেন মনে হয় ভারতমাতা তাঁর পুত্রকে আরও গৌরবান্বিত করার জন্য পুত্রের জন্মদিনের সহিত নিজের মুক্তির দিনটিকে যোগ করে দিয়েছেন।

পুরা নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। পিতা সুচিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষ। পিতার অসীম আগ্রহে সাত-আট বৎসর বয়সেই অরবিন্দ বিলেতে পড়াশুনা শুরু করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। প্রতিবারেই তিনি সব বিষয়ে বেশী নম্বর পেয়ে প্রথম হতেন। এই সময় তিনি বৃত্তি পেতেন মাসে ৫০৲ টাকা করে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস হয়েও তিনি ইংরেজ

সরকারের অধীনে চাকরি নেননি। যেন তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁর জন্য স্বতন্ত্র ভাগ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। চাকরি নিয়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি তাঁর চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা আন্দোলনকে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর করে জাতিকে এক মহামূল্য সম্পদের অধিকারী করে দিয়েছেন। ভবিষ্যৎজীবনে একদিন তাঁকে দেখার জন্য কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট সুদূর পণ্ডিচেরী আশ্রমে ছুটে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কর্মজীবনে এই জ্ঞান-তপস্বী কিছুদিন বরোদার মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে কাজ করেন। কিছুদিন পর তিনি বরোদা কলেজের অধ্যাপক এবং পরে সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু বেশী দিন বরোদায় থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের যিনি হোতা তিনি অধ্যাপকের পদ নিয়ে কেমন ভাবে সন্তুষ্ট থাকবেন ? তাই তিনি চলে এলেন বিপ্লবের দেশ বাংলায়। ইংরেজের স্কুলে শৈশব কাটালেও বাংলা মায়ের নাড়ীর টান তিনি ছিন্ন করতে পারেন নি, তাই বাংলাদেশেই তিনি স্বাধীনতা-যজ্ঞে প্রথম আহুতি দেন। আর সেই সময়টাই ছিল আহুতি দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। কারণ লর্ড কার্জনের কলমের খোঁচায় ঐ সময়ই বাংলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হতে যাচ্ছিল। আর কার্জনের সেই নিন্দার্হ কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য চারদিকে গড়ে ওঠে ছোট ছোট বিপ্লবী দল। জ্ঞান-তপস্বী হয়ে উঠলেন অগ্নিযুগের এক বিপ্লবী নেতা। এই সময়ই তিনি বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন, আর 'বন্দে মাতরম্'এ অরবিন্দের লেখা পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্মিত হয়। এমন সুন্দর ইংরেজী ভাষা যে কোন ভারতবাসী লিখতে পারে তা কারুরই জানা ছিল না। এই পত্রিকার মাধ্যমে অরবিন্দ নির্ভীকভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে তখন সাহেব হত্যার ধুম পড়ে গিয়েছে। ইংরেজের পুলিস সন্দেহ করল যে বিপ্লবীরা এসবের পিছনে রয়েছে, এবং শ্রীঅরবিন্দকেই তারা বিপ্লবীদলের নেতারূপে স্থির করল। একদিন খুব ভোরে অরবিন্দের গৃহে পুলিস অতর্কিতে হানা দিল। তখনও তিনি ঘুম থেকে উঠেন নি। এমন সময় স্বয়ং পুলিস কমিশনারের ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙ্গল। এদিকে পুলিস তখন ঘরটিকে তোলপাড় করে সন্দেহজনক কিছু খুঁজছে। কিন্তু এত করে খুঁজেও যখন তারা কিছুই পেল না তখন হতাশ হয়ে ফিরবার উদ্যোগ করল। এমন সময় হঠাৎ একটি কাগজের বাক্স দেখে তারা লাফিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই গোলা-বারুদ বা কোন সাংঘাতিক জিনিস ওখানে আছে। মাটির গুঁড়োর মত কি একটা জিনিসও পাওয়া গেল। পুলিসের লোকেরা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। বহু প্রকারে তারা প্রশ্ন করল। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী অরবিন্দ উত্তর দিলেন যে এতে কালীবাড়ির পবিত্র মৃত্তিকা আছে। কিন্তু পুলিসের বড় কর্তা তা বিশ্বাস করলেন না। সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর পর্যন্তও নানা পরীক্ষা করেও তারা সন্তুষ্ট হতে না পেরে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আলীপুর জেলের এক নিভৃত কক্ষে তাঁকে বন্দী করে রাখা হল।

বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ বিষ্ণু ভাস্কর নামক এক সাধুর কাছ থেকে যোগের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। জেলের নিভৃত কক্ষে মৃত্যু-প্রতীক্ষারত অরবিন্দ সেই শিক্ষাই কাজে লাগাতে শুরু করলেন। তপস্যা শুরু করলেন তিনি, কারাকক্ষের মধ্যে তাঁর ইষ্টদেবতা কৃষ্ণের দেখা পেলেন। দিব্য বর লাভ করলেন তিনি। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা দেখা দিলেন মহাযোগী রূপে। তিনি চাইলেন বিশ্ব মানবের মুক্তি ও কল্যাণ।

অবশেষে, ভারতমাতার অপর এক সুযোগ্য পুত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরিচালনায় তাঁর মামলার রায় বেরোল। নির্দোষ বলে প্রমাণিত হলেন তিনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তিনি কারাকক্ষ থেকে মুক্তি পেলেন। চলে গেলেন সুদূর পণ্ডিচেরীতে। নতুনতর তপস্যার মধ্যে ডুবে গেলেন। সারা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে চললেন সেই ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করতে। পণ্ডিচেরী আশ্রম হয়ে উঠল এক মহাতীর্থস্থান। আর সেই পুণ্যতীর্থ থেকে মহাসন্ন্যাসী প্রচার করলেন তাঁর সাধনালব্ধ অমর বাণী। সেই সাধনার এবং সুমহান বাণীর মর্মার্থ আমাদের সকলেরই জানা উচিত।

পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে স্বীকার করে। যা চোখে দেখা যায় না বা অঙ্ক কষে বের করা যায় না তাকে পাশ্চাত্ত্যের জনগণ স্বীকার করে না। তারা স্বীকার করে না যে ভগবানের অদৃশ্য শক্তি আমাদের সকল কাজের নিয়ামকরূপে আছেন। শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুঝেছিলেন যে সমস্ত কাজের পশ্চাতেই রয়েছে এক অদৃশ্য মহাশক্তি এবং এই মহাশক্তির সঙ্গে তিনি সংযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু ধর্মপথে চলেও মানুষের দুঃখ দূর হয় না কেন? ধর্মই যদি সত্য হয় তবে ধার্মিকের ক্রন্দন আজও শোনা যায় কেন? এ প্রশ্নও সেই মহাযোগীর মনে জাগে এবং সাধনার দ্বারা সে প্রশ্নের উত্তরও তিনি পান। সামান্য এক কণা জীবাণু থেকে মানুষ নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এই উন্নত মনের অধিকারী হয়েছে। এই উন্নত মনের জন্যই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে শক্তি এক ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের এই উন্নত মনকে সৃষ্টি করেছে, সে শক্তি আজও থেমে যায় নি। এমন সময় আসবে সে তখন আরও উন্নত মনের উন্নততর মানুষ সৃষ্টি করবে। সেই উন্নততর মনের নাম দিয়েছেন তিনি 'অতিমানস'। যেদিন অতিমানসের সন্ধান মানুষ পাবে সেদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তবে মানুষের এরূপ শক্তিও সুপ্ত আছে, যার সাহায্যে সে অতিমানসের সন্ধান নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ নিজের সাধনার দ্বারা সেই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, এই হলো অরবিন্দ সাধনার মূল কথা।

আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর স্থূল দেহের ক্ষয়কে আমরা মৃত্যু বলে স্বীকার

করব না কোন দিন। আজ আমরা নত-মস্তকে তাঁকে স্মরণ করি, আর স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের অরবিন্দ-প্রশস্তির সেই অংশটুকু—

"…দেবতার দূত হয়ে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

কিশোর

॥ শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী (গ্রাঃ নং ১৮৪৬৫) ॥

কিশোর মোরা দেশের আশা
অমিয় ভরা বক্ষেতে।
সব সাধনা সুপ্ত মোদের
অভয় কালো চক্ষেতে।

বিশ্বকবির ছন্দ মোদের
দুষ্টু চোখের দৃষ্টিতে,
নতুন যুগের স্বপ্ন মোদের
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিতে।

মুখ কেন মা, দুঃখমলিন,
চক্ষে কেন অশ্রুলোর ?
সুভাষ রবির স্বপ্ন দিয়ে
গড়বো সফল মূর্তি তোর।

শপথ নিলাম, তোর তরে মা
করবো সারা জীবন-পণ,
বিশ্বে মোরা নিঃস্ব তো নই—
কাঙাল মায়ের পরম-ধন॥

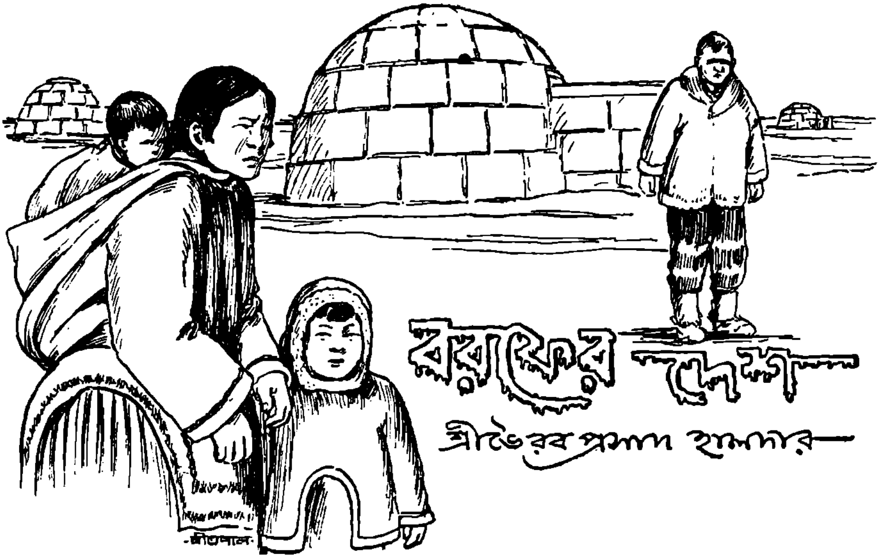

বরফের দেশে

শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার

অরুণাংশুরা আরও অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। কর্মরত মানুষগুলোকে এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে। একদিকে ওদের শ্লেজ-গাড়ীগুলো দাঁড় করানো। কুকুরগুলোও বাঁধা। ওগুলো চীৎকার করছে। এস্কিমোদের মধ্যে খাবারের অভাব ভয়ঙ্কর। খুব সৌভাগ্য থাকলে তবে একটা এস্কিমো পরিবার সারা বছরের খাবার যোগাড় করতে পারে। তাই কুকুরগুলোর ভাগ্যে পুরো খাবার কখনও জোটে না। ওরা সব সময় ক্ষুধার্ত থাকে।

নরিসের কাছ থেকেই অরুণাংশু শুনেছে যে, এস্কিমো পরিবারের কাছে খাবার সংগ্রহ করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। শুধু খাবার সংগ্রহ করলেই হবে না, তাকে আবার জমিয়ে রাখতে হবে। ওরা কাঁচা শুকনো মাংস যেমন খায়, তেমনি আবার সিদ্ধ করে খেতেও ভালবাসে। খাবার যখন ওদের হাতে থাকে তখন ওরা খুব দিলদরিয়া। কিন্তু খাবারের সঞ্চয় যখন ফুরিয়ে যায় তখন ওরা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অতি প্রিয় শ্লেজের কুকুরগুলো মেরে খেয়ে নেয়। তাঁবু বা পোশাকের শুকনো চামড়ার টুকরো পেটে পোরে। এমনিতে কোনও এস্কিমো নর-মাংসাশী না হলেও দুর্ভিক্ষের সময় না কি নিজের ছেলেকেও খেয়ে ফেলে। তবে এমন সাংঘাতিক ধরণের দুর্ভিক্ষ খুব কমই হয়।

নরিস আবার বলতে শুরু করলো—ফেরবার পথে দেরী হয়ে গেল। সামনে অন্ধকার রাত, তার ওপর প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে। এমন সময় বাইরে থাকা একটুও নিরাপদ নয়। চুগাচিগ আমাকে নিয়ে একটা ইগলুর দরজায় হাজির হল। কুকুরগুলো বাঁধা রয়েছে ইগলুর বাইরে। বরফের মধ্যে সারা শরীর ঢুকিয়ে বসেছিল। আমাদের সাড়া পেয়েই লাফিয়ে উঠে চীৎকার শুরু করলো। ওদের চোখগুলো আগুনের মতন জ্বলছিল। এস্কিমো পুরুষটি বাইরে বেরিয়ে এল। আমাদের দেখে খুব

খুশী। ওরা খুব অতিথিপরায়ণ নিজেরা শত অসুবিধার মধ্যে থাকলেও অতিথি এলে ওরা ভারী খুশী হয়ে ওঠে। আমরা ওর সঙ্গে ইগলুর মধ্যে ঢুকলাম।

বরফের উপর দিয়ে চলতে চলতে নরিসের গল্প খুব ভাল লাগছিল অরুণাংশুর। এস্‌কিমোদের জীবনে এই অতিথিপরায়ণতা একটা খুব ভাল গুণ। আর শুধু এস্‌কিমো কেন? জগতে প্রায় প্রত্যেক জাতির বংশধররা আজও খুব অতিথিপরায়ণ। পাশ্চাত্য-জীবনের ধাক্কা এবং আর্থিক দুর্গতি থাকা সত্ত্বেও তারা এখনও তাদের ঘরের দরজা থেকে অতিথিদের বিমুখ করে না।

—ইগলুটা খুবই ছোট। হয়ত আগের কোন এস্‌কিমো পরিবার এটা তৈরী করেছিল। ওরা আজ এসে এটা অধিকার করেছে। এমন অনেক ইগলু এই বরফের রাজ্যে আছে। যাতায়াতের রাস্তায় এক দলের ছেড়ে যাওয়া ইগলু আর এক দল অধিকার করে। এদের পরিবারে লোক মাত্র তিন জন—স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছেলে। ওরা তখন সবাই খাওয়ার যোগাড় করছিল। গরম ঝোলের কেটলি নিয়ে ওরা বসেছিল। আর এস্‌কিমো-বউ তার প্রদীপটার তদারক করছিল। এস্‌কিমো-বউদের এটা একটা কাজ। এস্‌কিমোদের প্রদীপ দেখেছ, মিটার?…নরিস থেমে অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকাল।

—না ত!…জবাব দিল অরুণাংশু।

—ইগলুর মধ্যে প্রদীপ ওদের নিত্যসঙ্গী। আর এই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব এস্‌কিমো-বউয়ের। বিচিত্র-গঠন এই প্রদীপটিকে সব সময় তদারক করতে হয়। নইলে ধোঁয়ায় ভরে যাবে সারা ইগলু। এস্‌কিমো-বউ বাইরে গেলে আর কেউ এসে বসে তার জায়গায়। সোপ-স্টোন থেকে ওরা ওদের প্রদীপ তৈরী করে। চওড়া থালার মতন—দু'ভাগে ভাগ করা। এক ভাগে থাকে জমাট চর্বির ডেলা। সীল-সিন্ধুঘোটক-তিমির চর্বি ওরা প্রদীপে ব্যবহার করে। উত্তাপে গরম চর্বি থেকে তেল বেরিয়ে দ্বিতীয় খোপে জমা হয়। সেখানে থাকে শুকনো ঘাসের সলতে। গরমকালে ঘাস যোগাড় করে রেখে দেয় এস্‌কিমো-বউ। এটি না হলে ইগলুর মধ্যে আঁধার ভোগ করতে হবে। মাঝে মাঝে একটা হাড়ের টুকরো দিয়ে এস্‌কিমো-বউ সলতে উস্‌কে দেয়। আলো জোরালো হয়। একটুও ধোঁয়া হয় না। জান মিটার, কেবল আলোর জন্য নয়, ওদের রান্নাবান্নার সব কাজ হয় প্রদীপের সাহায্যে।

—তাই না-কি!…অরুণাংশু অবাক হয়ে বলল।

—ওদের প্রদীপের চারদিকে চারটে কাঠি পুতে তার উপরে আবার দু'টো কাঠি বেঁধে আড়া করা হয়। তার একটাতে থাকে চায়ের কিংবা ঝোল রান্না করার কেটলি, আর একটা থেকে ঝোলে জলের কেটলি। ওটা সব সময় চাপানো থাকে।

—এস্‌কিমোরা কি তেষ্টা পেলে বরফ খায় না?

—আরে, না না। বরফের দেশের মানুষ হলেও ওরা কখনও বরফ খায় না। দেখবে প্রত্যেক দিন সকালবেলা ওদের ছেলেমেয়েরা বরফ নিয়ে আসে। প্রদীপের উপর রাখা কেটলিতে

সেই বরফ গলে জল হয়। যার যখন তেষ্টা পায়, সেই জল পান করে। সাধারণতঃ পুরাণো বরফ ওরা সমুদ্রের উপর থেকে নিয়ে আসে। সে জল একদম নোনতা হয় না। খাওয়া-দাওয়া চুকলে ওরা প্রদীপের উপরে ওদের ভিজে জামা-জুতো ঝুলিয়ে রাখে।—এই বলে নরিস্ থামল।

—খাওয়ার সময় তোমরা উপস্থিত হলে ওরা নিশ্চয় খুব খুশী হয় নি ?—অরুণাংশু শুধাল।

—ঠিক তার উলটো মিটার। ওরা আমাদের পেয়ে ভীষণ খুশী হল। ওদের চামড়া-ঢাকা বিছানার উপর আমরা বসলাম। আমার মতন একজন বিদেশীকে অতিথি হিসাবে পেয়ে ওরা আরও খুশী হয়ে উঠল। এস্কিমো-কর্তা ওদের ভাঁড়ার থেকে পাখীর শুকনো মাংস আর হরিণের চর্বি নিয়ে এল। এ দুটোই ওদের কাছে সুখাদ্য। পালে-পার্বণে কিংবা অতিথি এলে ওরা এমনি ধরণের খাবার খায় ও খাওয়ায়। পেঙ্গুইনের মতন ছোট ছোট ডানাওয়ালা এক রকমের পাখী শিকার করে ওরা সীলের চামড়ায় পুরে রাখে। পাখীগুলো তারই মধ্যে শুকিয়ে জমে থাকে। এস্কিমো-কর্তা এক টুকরো পাখীর মাংস কেটে মুখে পুরল। তারপর থু-থু করে ফেলে দিয়ে বলল যে, সে অত্যন্ত গরীব তাই এমনি বিশ্রী খাবার অতিথিদের সামনে ধরে দিয়েছে। আমি খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু চুগাচিগ খুব সেয়ানা। অতিথিদের সামনে এস্কিমোরা এমনিভাবে বিনয় দেখায়। চুগাচিগ তাড়াতাড়ি শুকনো একটা পাখী কেটে কেটে মুখে পুরতে লাগল। আমাকেও খেতে ইঙ্গিত করল। আমি খানিকটা মাংস মুখে পুরে দিলাম।

—এস্কিমো-কর্তা খুব খুশী হল ?—অরুণাংশু জিজ্ঞাসা করল।

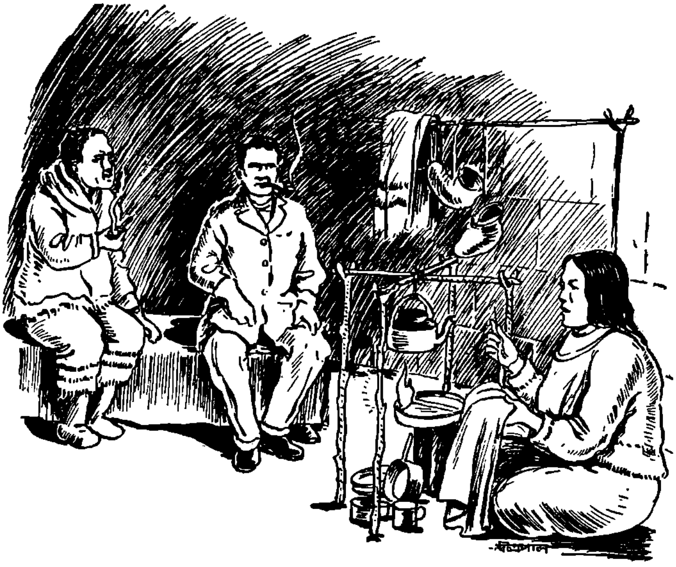

—সে আর বলতে! এস্কিমো-কর্তাও খাওয়া শুরু করল। ওদের খাওয়ার রীতি ভারী অদ্ভুত। খানিকটা চর্বি তুলে নিয়ে এস্কিমো-কর্তা তা থেকে একটু কেটে নিয়ে নিজে খেল। তারপর বাকীটা সে এগিয়ে দিল তার বউয়ের হাতে। সেও আবার খানিকটা কেটে নিয়ে বাকীটা এগিয়ে দিল তার ছেলে মেয়ের দিকে। এমনি-

ভাবে ঝোলের বাটি থেকেও ওরা ঝোল খায়। সব শেষে খায় চা কিংবা কফি। চা কিংবা কফি ওরা গরম খায় না—ঠাণ্ডা করে নিয়ে খায়। খাওয়া-দাওয়ার পর এস্‌কিমো-বউ থালা-বাসন পরিষ্কার করে প্রদীপের পাশে রেখে দেয়। এস্‌কিমো-কর্তা তার পাইপ ধরায়। ছেলেরা শুয়ে পড়ে। মেয়েরাও অবশ্য পাইপ ধরায়। প্রদীপের পাশে বসে এস্‌কিমো-বউ ছেঁড়া পোশাক সেলাই করে। আজকাল লোহার ছুঁচ ব্যবহার করে। শুকনো পশু-তন্ত্রী সুতোর কাজ করে।

নরিস্ থামল। নিজের পকেট থেকে পাইপ বার করে ও ধরাবার চেষ্টা করল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া—লাইটারে আগুন ধরে না, অনেক চেষ্টায় নরিস পাইপ ধরাল।

—খাওয়া-দাওয়ার পর কি তোমরা শুয়ে পড়লে?—অরুণাংশু শুধাল।

—আমরা দু'জন অতিথি ছিলাম। তাই এস্‌কিমো-কর্তা আমাদের খুশী করার জন্য গান-বাজনার আসর বসালে। পাশাপাশি ইগলু থেকেও দু'একজন এসে উপস্থিত। একে একে ওরা গান গাইতে লাগল। এখানেও বিনয় দেখাবার জন্য গায়ক বলল, আমি গাইতে পারি না। গলা ভাল নয়। তখন সবাই ওকে অনুরোধ করতে গান শুরু হল। সহজ সরল সুরের গান। তার সঙ্গে নাচ। একই গানের কলি ওরা ফিরে ফিরে গাইতে থাকে। প্রত্যেক গায়ক গানের শেষে শিস্ দেয়। শ্রোতারা খুশী হয়ে হাসতে থাকে। গায়কও আনন্দিত হয়।

—গায়ক নিজেই কি গান গাইল?—অরুণাংশু শুধাল।

—ওরা কর্মরত মানুষগুলোর খুব কাছে এসে পড়েছে। এস্‌কিমো মেয়ে-পুরুষ দু'জনই হাত লাগিয়েছে ঘর তোলার কাজে। বাচ্চাগুলো বসে আছে শ্লেজ-গাড়ীতে। ওগুলো এখন নিস্তব্ধ। বরফের উপর খুঁটি পুতে কুকুরগুলোকে বেঁধে রেখেছে। কয়েকটা কুকুর বরফের উপর শুয়ে শুয়ে হাড় চিবোচ্ছে। ওরাই বলতে গেলে এই বরফের রাজ্যে এস্‌কিমোদের সবচেয়ে বড় বন্ধু।

এস্‌কিমোদের রীতি গায়ক নিজেই নাচে। তার হাতে একটা বাজনাও থাকে। ওটা বাজায়, গান গায় আর নাচে। শ্রোতারা গোল হয়ে বসে তাকে তারিফ জানায়। সেদিন রাতে ওদের নাচ দেখে আর গান শুনে, আমার কি মনে হল জান মিটার?

—কি?—অরুণাংশু জানতে চাইল।

—নাচ-গান মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঁচবার জন্য, দেহ ধারণের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আনন্দের। আর এই আনন্দলাভের সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে, নাচ আর গান। তাই সভ্য-অসভ্য সব জাতের লোকের মধ্যেই নাচ-গানের এত কদর। নাচ-গান আর হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে ওরা নিজেদের জীবন-যন্ত্রণার কথা ভোলবার চেষ্টা করে।

নরিস থামল।

(ক্রমশঃ)

জলের ম্যাজিক

॥ যাদুকর এ. সি. সরকার ॥

হাতের কাগজখানা লাহিড়ী মশাইর দিকে এগিয়ে দিয়ে রাগের সঙ্গে বললেন মিত্তির মশাই, "বলেছিলাম না আপনাকে এ সব ওদের কর্ম নয়। তবে হাঁ, হতেন যদি এ. সি. সরকার তবে দেখতেন কাণ্ডখানা কী হত! জলের উপর দিয়ে হাঁটা এ. সি. সরকারের কাছে এক পেয়ালা জল খাওয়ার মতনই সহজ কাজ।"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেলাম মিত্তির মশাইর কথা। বুঝলাম, 'বোম্বাই যোগী'র জলের উপরে হাঁটতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাঁদের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি না করে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দু' পা এগুতে না এগুতেই মিত্তির মশাইর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

"এই যে যাদুসম্রাট, কোথায় পালাচ্ছেন? এবার তো আপনার পালা। যেখানে যে ম্যাজিক ফেল করে, সেই ফেল পড়া ম্যাজিককে আবার নতুন প্রাণ দিয়ে অভিনব বিস্ময়ের আসনে বসানোতেই তো আপনার কৃতিত্ব।"

এর পরে মিনিটখানেক তাঁর চশমার কাঁচের উপর দিয়ে নিবিষ্টমনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—"জলের উপর দিয়ে হাঁটার কোন কৌশল আবিষ্কার করতে পারলেন নতুন করে? বোম্বাই যোগীরাজ তো ফেলিওর!"

মিত্তির মশাইর প্রশ্নের উত্তরে এই বিষয়ে আমার বহুদিনের গবেষণা, নতুন কৌশল আবিষ্কারের সাফল্য আর পরিশেষে সেই অভিনব পদ্ধতি যা কয়েক মাস আগে আবিষ্কার করেছি তা কপিরাইট করানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন করার বিষয় সমেত সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। শুনে মিত্তির মশাইর চোখ-মুখ ভরে উঠলো এক পরম তৃপ্তি আর গর্বের সুখানুভূতিতে। রুদ্ধস্বরে বললেন তিনি—"বাঙলার জয় হোক, বাঙালীর জয় হোক।"

মিত্তির মশাইর ভাবমগ্নতার সুযোগে এগিয়ে এলেন লাহিড়ী মশাই, বললেন—"কপিরাইট না হওয়া অবধি তো ও খেলা দেখাবেন না। যাক, অন্য কোন খেলাই দেখান একটা।"

লাহিড়ী মশাইর প্রস্তাবে রাজী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলাম। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। তন্ময়তা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যে মিত্তির মশাই আমাকে প্রশংসায় প্রশংসায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন তা আমার অজানা নয়।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ক্লাবের পার্ট টাইম বেয়ারা দীনু। দীনুর হাতে পয়সা দিয়ে বললাম—"সামনের দোকান থেকে একটা সোডা ওয়াটার আর একটা গ্লাস নিয়ে এসো তো, বাবা। পেটটা বড় গোলমাল করছে।"

মিনিট দুয়েক পরেই ফিরলো দীনু। চাবি দিয়ে বোতল খুলে দিল সে। গ্লাসের মধ্যে সোডা ওয়াটার ঢালতেই ঘটে গেল এক তাজ্জব ব্যাপার। বর্ণবিহীন সোডা ওয়াটার হয়ে গেল টুকটুকে লাল। বুদ্ধি করে দীনু এক ফালি লেবুও এনেছিল। এই লাল জলে লেবুর রস মিশিয়ে দিলাম। রঙ কোথায় মিলিয়ে গেল—পড়ে রইলো সাদা জল। এই আজব ব্যাপার দেখে অবাক হলেন সবাই।

এবার শোন খেলাটার কৌশল। ক্লাবে আসার পথে দোকানদারকে কিছু পয়সা বকশিশ করে তার কাছে রেখে এসেছিলাম একটা বোতল, একটা গ্লাস আর এক ফালি লেবু। বোতলটা ছিল সোডা ওয়াটারের একটা খালি বোতল। এর মধ্যে ভরে এনেছিলাম খানিকটা চুনের জল। গ্লাসটার ভেতরে মাখানো ছিল কিছুটা 'ফেনাপথেলিন' গুঁড়ো। এলোপ্যাথি ডাক্তারখানাতে এ গুঁড়ো পাওয়া যায়। সাবধানে ব্যবহার করতে হয়, মুখে গেলে দাস্ত হয়। দোকানীকে শেখানোই ছিল সব। দীনু চাইতেই সে এই সব জিনিস দিয়ে দিয়েছিল। এখন ব্যাপারটা ঘটেছিল এক রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে। ফেনাপথেলিনের সঙ্গে চুনজল মিশতেই তা হয়ে যায় লাল। লেবুর রস মিশলে ঐ লাল জল আবার আগের মত বর্ণবিহীন হয়। এ হচ্ছে একটা রাসায়নিক ম্যাজিক। করে দেখো, তোমরাও পারবে।

মহীয়সী নারী

(ভারত ইতিহাসের এক কোণ)

॥ শ্রীসতীরাম বিশ্বাস ॥

হর্ষবর্ধন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কোন বিদেশী শত্রু ভারত আক্রমণের কথা চিন্তা করে নি। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ভারত হলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। শক্তি হলো ক্ষীণ। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আরব খলিফা সৈন্যদল পাঠান ভারত আক্রমণে। ভারতীয় ত্রিশূলের আঘাতে পরাজিত হলো পর পর দুইজন সেনাপতি। নাম উবেদুল্লা ও বুদেল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে সম্রাট ওয়ালিদ সেনাপতি মহম্মদকে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে ভারতে পাঠালেন। ভারতের দেবল দুর্গ হলো আক্রান্ত। যুদ্ধে দেশের সম্মান রক্ষায় বামনাবাদ যোগ দিল।

রাজা দাহর প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত। আক্রমণকারীর শক্তির কথা চিন্তা করলেন না। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন, তিনি তাঁর সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন—"আরবদের আক্রমণ কর।"

যুদ্ধ চললো সমান তালে। অসিতে অসিতে বিদ্যুৎশিখা, বাণ আর শূলে আকাশ ছেয়ে গেল। হাতী আর অশ্বের পায়ের শব্দ যেমন ভয়াবহ, তেমনি আহতদের করুণ চীৎকার।

অগ্নিযুক্ত তীরে আহত হয়ে দাহরের হাতী একবার ছুটে গেল নদীতে। ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু হলো বিপুল বিক্রমে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণ দিল ২৬ হাজার হিন্দু বীর। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হলেন দাহর।

ভারতের বুকে প্রথম উড়ল অর্ধচন্দ্র-চিহ্নিত বিদেশী পতাকা।

তারপর খবর পৌঁছালো রাজধানীতে আর বামনাবাদের রাণী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রক্ষা করলেন নিজের সম্মান।

তারপর ?

তারপর দাহরের দুই কন্যা সূর্যদেবী ও পরিমল দেবী বন্দিনী হলেন আরব সেনাপতি মহম্মদের হাতে। বন্দী অবস্থায় তাঁরা নীত হলেন খলিফার হারেমের শোভা বৃদ্ধির জন্য।

খলিফা দুই ভারত রমণীর মোহনীয় রূপ দেখে হলেন মুগ্ধ; বললেন—"আমি তোমাদেরকে বিয়ে করতে চাই।"

সূর্যদেবী হাত জোড় করে বললেন—"মহান সম্রাট, আমাদের কারও সাথে আপনার বিয়ে হতে পারে না, কারণ আপনার সেনাপতি মহম্মদ আগে গোপনে আমাদিগকে বিয়ে করেছেন।"

খলিফা তাঁর স্বভাবোচিত গর্জন করে উঠে বললেন—"আমার ভৃত্যের এত বড় স্পর্ধা! উত্তম, আমি ওর শাস্তির বিধান করব।" এই বলে আদেশ দিলেন—"তাকে যেখানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে কাঁচা চামড়ায় সেলাই করে আমার নিকট হাজির কর।"

মহম্মদ ছিল ভারতে। সেখানে তাকে বন্দী করা হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারত থেকে আরবে যাবার ব্যবস্থা ছিল না বর্তমানের মত। সময় লাগত অনেক দিন। খলিফার আদেশ মত কাঁচা চামড়ায় পুরে সেলাই করে পাঠান হলো মহম্মদকে। চামড়া শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে দেহের চারিপাশে চেপে বসে গেল। যথাসময়ে চামড়ার থলি খলিফার নিকট গেল। কিন্তু তার মধ্যে মহম্মদ জীবিত ছিল না, ছিল মৃত।

খলিফা নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে বললেন—"দেখ সূর্যদেবী, আমার ভৃত্য অন্যায় করলে কি শাস্তি পায়!"

সূর্যদেবী বলে উঠলেন—"আমাদের পিতাকে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলেছিলাম আপনাকে। মহম্মদ আমাদের বিয়ে করেন নি।"

খলিফা চীৎকার করে বললেন—"শয়তানী, তোদের জন্য আমি আমার অনুগত ভৃত্যকে সংহার করেছি, তোদেরও আমি হত্যা করব।"

সূর্যদেবী বা পরিমল দেবী কি উত্তর দিয়েছিলেন আমরা জানি না। তাঁরা ছিলেন স্বাধীন ভারতের হিন্দু নারী, যাঁরা হাসিমুখে প্রাণ দিতেন।

আমাদের মনে হয়, সূর্যদেবী হয়তো উত্তর দিয়েছিলেন—"হে খলিফা, কি ভয় দেখাও? বিধর্মীর হাতে পড়ে ভারতের হিন্দু নারী মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না। আর জন্মভূমির শত্রুকে পৃথিবী থেকে দূর করে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ যখন নিয়েছি, তখন মরতে আর ভয় কি?"

আধুনিক ইতিহাস গল্পটাকে রূপকথা মনে করে। কিন্তু ইস্‌লামের ও ইউরোপের ইতিহাসে এ কাহিনী পাওয়া যায়। সিন্ধু বিজয়ের পর যে মহম্মদকে কঠোর ভাবে হত্যা করা হয়, তার প্রমাণও ইতিহাসে আছে।

লিমেরিক

॥ পরিতোষকুমার চন্দ্র ॥

কালাচাঁদ শর্মা
বাড়ী তার বর্মা,
পা দুটো ওপরে তুলে নীচে রেখে হাত
দিনেতে ঘুমোয় আর জাগে সারারাত
এমনি অকর্মা।

দাসেদের ভীমটা
হাতে নিয়ে চিমটা
দিন রাত
খায় ভাত
তার সাথে খায় নিম, করলা বা শিমটা।

রেলগাড়ী চড়লাম যাবো আমি মালদা,
কি জানি কেমন করে পৌঁছেছি ঝালদা।
সবাই বলে নতুন এটা নয়
প্রত্যেকেরই এমনি ভুলই হয়
ঘৃত বলে খায় যারা বনস্পতি দালদা।

কেষ্টপুরের বোষ্টমদের রামকেষ্টর বেহাই
মাথায় করে একদিন সে ব'য়ে এনে নেহাই—
ধরলো যা এক গান
নেই কোনো তাল-মান,
থেকে থেকে নেহাই পিটে মারে শুধু তেহাই।

বিজ্ঞান-পত্র

॥ সঞ্জয় ॥

॥ সৌর শক্তি ॥

তোমরা কি জান, পৃথিবীর মাটির নীচে যত কয়লা, তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস আছে আগামী দু'শ' বছরের মধ্যে তার সমস্তটাই শেষ হয়ে যাবে? ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ। দিন দিন মটরগাড়ী, বড় বড় বৈদ্যুতিক ট্রেন, জেট প্লেন, হাজার টনের জাহাজ—এদের সংখ্যা যেন বেড়েই চলেছে। তারপর তোমাদের ঘরের আসবাবপত্রের কথাই ভাব। মানুষ একদিন বনের কাঠ বা শুকনো গাছপালা জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করত। আর আজ? কেরোসিনের আলো, কয়লার উনুন, বৈদ্যুতিক হিটার, বাল্ব, রেডিও, ফ্রিজ, টেলিভিসন—মানে হিসেব করলে পাগল হয়ে যেতে হবে। মানুষের দরকারটা কি দারুণ ভাবে বেড়ে চলেছে বল দেখি? এতদিন নাপিত এসে খুর দিয়ে দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যেত। এখন বৈদ্যুতিক খুর তৈরী হয়েছে। গালে লাগানর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিপাটি করে দাড়িটি সাফ হয়ে গেল। এমন কি কোন কোন দেশে রেস্টুরেন্টের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে। রেস্টুরেন্টে ঢুকে কতকগুলি ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্যে পয়সা ফেলে দাও। গায়ে দাম লেখাই আছে—ঠিক অটোমেটিক টেলিফোনের মত যা তোমরা পথের মোড়ে বা বড় বড় স্টেশনে দেখতে পাও। অমনি দেখবে যে বস্তুটি চাও তা সুন্দর প্যাকেটে মুড়ে বা কাপে করে তোমার সামনে হাজির হয়েছে! আর কলকারখানাই কি কম বেড়ে গেছে? ব্যাপারটা দেখে পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন। শক্তি বলতে আমরা সাধারণতঃ উত্তাপ বা বিদ্যুৎশক্তিকেই বুঝি। উত্তাপ পাই আমরা কয়লা, তেল বা গ্যাস পুড়িয়ে, অথবা বিদ্যুতের সাহায্যে। বিদ্যুৎ কিন্তু আমরা পাই আবার ঐ উত্তাপ থেকেই। বাতাস বা জলের বেগ দিয়ে জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে বটে; কিন্তু সব সময় তো ওদের কাজেও লাগান যায় না! এর মধ্যে আবার ভারী ভারী রকেট, মহাকাশযান ওড়ান শুরু হয়ে গেছে। ঐ এক একটি রকেট তুলতে যা জ্বালানি পোড়ান হয় তা দিয়ে বড় বড় এক একটি কারখানা কয়েক বছর ধরে চালান যেত। অতএব বুঝতেই পারছ, আমাদের কয়লা, তেলের ভাঁড়ার কত তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে। কেউ কেউ তো এমন ভাবছেন—আর বেশী দেরী নয়, শ' খানেক বছর তোফা আরাম করে নাও। তারপর বুঝবে বাছাধন, আরাম কাকে বলে। রেলগাড়ী চলবে না, উনুন জ্বলবে না, পাখা ঘুরবে না—সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে—মানে এক কথায় সব সাবাড়!

কিন্তু থামলে তো চলবে না! উপায় একটা চাই। হ্যাঁ উপায়ের সন্ধানও পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে আমাদের সূর্যের কাছ থেকে। তোমরা হয়ত অনেকেই জান না, এই যে বড় বড় কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উড়ছে, এই যে লুনা, জোন্দ, স্পুটনিক, মেরিনার, টাইরস আকাশে বিচরণ করেছে বা করছে এরা নিয়মিত আকাশের নানা রহস্য আমাদের পাঠাচ্ছে বিদ্যুৎশক্তির মাধ্যমে। প্রচণ্ড সে বিদ্যুৎশক্তি। এই যে সেদিন সার্ভেয়ার চাঁদে নেমে, সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে চাঁদ সম্পর্কে আমাদের কত কথা জানাল—সেও ঐ বিদ্যুৎশক্তিরই সাহায্যে। আর সে বিদ্যুৎশক্তি এরা তৈরী করেছে অতি সহজে শুধুমাত্র সূর্যরশ্মি থেকে। সম্প্রতি পৃথিরীর নানা দেশ সৌর শক্তি থেকে উত্তাপ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে মেতে উঠেছে। হিসেব করে দেখা গেছে তোমাদের বাড়ীর ছোট্ট ছাদের ওপর যতটা সূর্যের আলো এসে পড়ে যদি তার দশ ভাগের এক ভাগও কাজে লাগান যেত তা হলে পাঁচ দিনের আলো ধরে তোমরা পুরো একমাস স্বচ্ছন্দে তোমাদের পরিবারের সমস্ত উনুন, পাখা, রেডিও, ফ্রিজ, জলের পাম্প সমস্ত চালাতে পারতে। জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া এবং পৃথিবীর নানা দেশ তো চালাতেই শুরু করেছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে জাপান প্রায় আড়াই লক্ষ হিটারই তৈরী করে ফেলেছে যাদের সাহায্যে সূর্যরশ্মি দিয়ে জল গরম করা হয়। এতে করে এক একটা হিটার পিছু একটন কয়লা বেঁচে গেছে। রাশিয়াতে বড় বড় জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎশক্তি তৈরী করা হচ্ছে বিশেষ ধরণের দর্পণের সাহায্যে সূর্যের উত্তাপকে এক জায়গায় ফেলে। কেউ কেউ শুধু সূর্যরশ্মি দিয়ে মহাকাশযান চালনার কথাও ভাবছেন। জল পাম্প করে চাষবাসও করা হচ্ছে ইস্রাইল, মিশর প্রভৃতি দেশে। রেডিও, টেলিভিসন, হিটার প্রভৃতি অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও চালান হচ্ছে শুধু সৌর শক্তিরই সাহায্যে। প্রথম খরচের ধাক্কাটা বেশী। তবে একবার খরচ করলেই নিশ্চিন্ত! সূর্য যতদিন আকাশে থাকবে, আমাদের ফ্যানও ঘুরবে, উনুনও জ্বলবে। হয়ত ভাবছ, সে না হয় হল—যখন সূর্য আকাশে থাকবে না, মানে রাতে অথবা আকাশ যখন মেঘে ঢাকা থাকবে—তখন? তারও ব্যবস্থা হয়েছে। মোটরগাড়ীতে যে ব্যাটারি ব্যবহার হয় তা দেখেছ? এই ব্যাটারিতে বাইরে থেকে বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখা হয়, যেমন তোমার বাবা মাইনের টাকা জমিয়ে রাখেন মানি-ব্যাগে। মাইনে তো আর রোজ হয় না। তখন ঐ জমান টাকা খরচ করলেই কাজ চলে। সূর্যরশ্মি থেকে সংগ্রহ করা বিদ্যুৎ অমনি করে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থাও হয়েছে। তা ছাড়া এমন কতকগুলি পদার্থ আবিষ্কার করা হয়েছে যাদের গরম করলে অনেকটা উত্তাপ ধরে রেখে দেয়। যেই ঠাণ্ডা করবে, ঐ উত্তাপ সে ছেড়ে দেয়। অতএব উত্তাপ শক্তিকেও জমিয়ে রেখে রাতের অন্ধকারে কাজ চালান যেতে পারে। মোট কথা সূর্যই এখন একমাত্র ভরসা। তাকে কাজে লাগাতে পারলে—ব্যাস! সমস্যা চুকে গেল। এবার তুমি যত শক্তি চাও—কোন আপত্তি নেই। কারণ সূর্যের ভাঁড়ার যে অফুরন্ত।

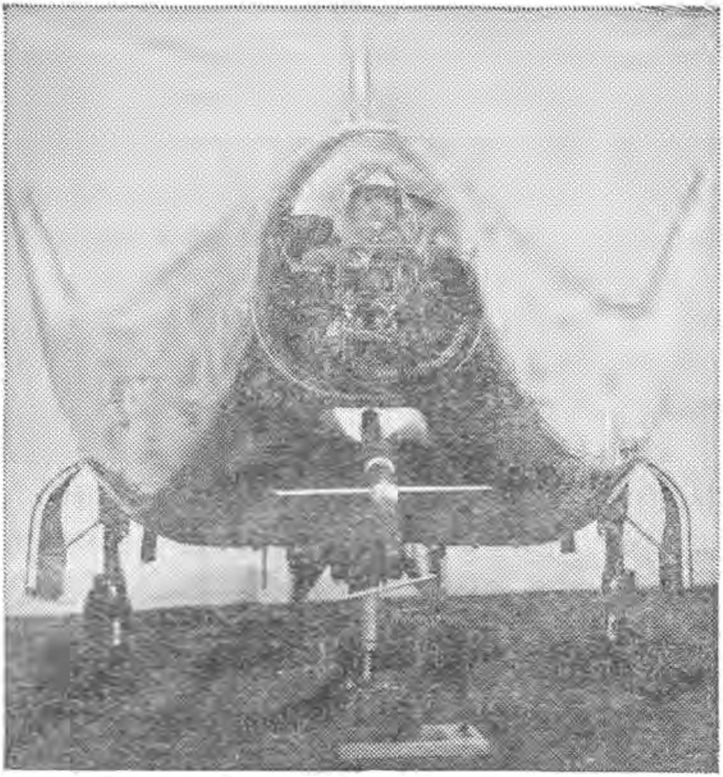

নতুন ধরণের এইচ এল-১০। এই আকাশযানটিতে মিলটন টমসন বসে রয়েছেন। তিনিই বার বার এই যানটিকে পরীক্ষা করে দেখছেন, সুদূর মহাকাশ থেকে সহজে এর দ্বারা পৃথিবীতে অবতরণ করা যায় কি না। মাছের পাখনার মত এর তিনটি পাখনা আছে। বিশেষভাবে চালিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়া-মণ্ডলে এমন ভাবে একে আনা হয় যাতে করে বাতাসের সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণে যানটি না পড়ে যায়। সাফল্যমণ্ডিত হলে ভবিষ্যতের আকাশচারীরা এই ধরণের যানে করেই নিরাপদে সুদূর কোন গ্রহ ও উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর পথে যাত্রা করবেন।

শরীরচর্চার বৈঠক

॥ বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায় ॥

আমার স্নেহের ভাইবোন সব!

বল তোমরা সব কেমন আছো। তোমাদের মধ্যে যারা এবার পরীক্ষা দিয়েছ তাদের মধ্যে যদি কেউ খুব ভাল 'রেজাল্ট' করে থাকো তবে ফটো সহ সব কিছু জানিয়ে পত্র দেবে—আমরা তা প্রকাশ করার চেষ্টা করবো, আর যারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হওনি তারা বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা কর যেন আগামী বারে কৃতকার্য হতে পার। ফল ভাল করা না করাটা ভাই নিজের ওপর নির্ভর করে। সঙ্কল্প জিনিসটাকে বেদমন্ত্রের মত শ্রদ্ধা করবে। ভাববে আমি যা সঙ্কল্প করবো যদি তা থেকে বিচ্যুত হই তবে ভীষণ অপরাধী হবো। এই ভাব ও ভীতি মনে আনতে পারলেই দেখবে যে কোন কাজে সঙ্কল্প ও সাধনা স্থায়ী করতে কষ্ট হবে না।

এবার তেমন একটা জোর বৃষ্টি হয় নি অথচ হওয়ার প্রয়োজন ছিল—তাতে ঋতু অনুযায়ী অসুখবিসুখগুলি কম হতো। তবে সময় এখনও যায় নি, হতেও পারে। তোমরা কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সাবধানে করবে। আগেও বলেছি এবারও বলছি, এমনি জল খাবে না, সেদ্ধ করে নিয়ে তাতে কর্পূর মিশিয়ে ঠাণ্ডা করে খাবে। এতে জলের জন্য আজকাল যেসব অদ্ভুত অসুখবিসুখের কথা শুনতে পাচ্ছো তা নিশ্চয়ই অনেক কম হবে।

তারপর বল তোমাদের কাছে গত বৈঠকে শেখানো 'ছোলাঙ্কুর' লাগলো কেমন? আশ্চর্য এত সব নতুন নতুন খাবার তৈরী শেখালাম—তৈরী করে একটিবার নেমন্তন্নও আমায় করলে না! তোমরা বুঝি ভয় পাও আমি অনেক খাই। মোটেই না, আমি তোমাদের চেয়েও কম খাই। বেশী খেলে শরীর ভাল হয় কে বলেছে? কম খেয়ে মানে আমার পরিমাণমত খেয়ে আমি খুব ভাল থাকি। তোমরাও তাই করবে। লোভে পড়ে বেশী পরিমাণ খাবে না বা যখন তখন খাবার দেখলেই খাবে না। আমি নিজেও তা করি না, কেউ করুক তা পছন্দও করি না।

পুজো তো এলো বলে, তার আগেই কিন্তু পরীক্ষা হবে স্কুলে। সাবধান ঠিক মত পড়ে যেও, আর পুজোর পরে বড় পরীক্ষা, তার জন্যও প্রস্তুত থেকো, বুঝলে?

যাক এবার তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের কিছু চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছি, মন দিয়ে পড়।

মলয় বিশ্বাস (কলিকাতা)। প্রঃ—(১) বুক, পা অনুযায়ী হাত মোটা নয়। বুকডন দিতে গিয়ে হাতে জোর পাই না। হাতে খুব করে মালিশ করবো?

(২) বন্ধুবান্ধবরা বলে—কি এক ওষুধ খেলে নাকি মোটা হওয়া যায়—খাবো কি?

(৩) ভাতের মাড় রোজ এক বাটি করে খেতে শুরু করেছি—এটা কি ভাল মনে করেন?

(৪) সপ্তাহে কি রোজ ব্যায়াম করবো? আমি তো আপাততঃ ক'দিন করছি।

(৫) Free hand Exercise-এ কি বেশ লম্বা হওয়া যায়?

উঃ—(১) তুমি 'বুকডন' আর 'কারলিং' করবে ; তার ফলে হাতে জোর বাড়বে আর মালিশ করবে ধীরে ধীরে।

(২) তোমার বন্ধুরা কি সবাই মোটা ? ওরা কি সেই ওষুধ খেয়ে মোটা হয়েছে ? তেমন ওষুধ ভাই আমার জানা নেই,—অবশ্য সত্য হলে রোগা সন্তান আর বাংলা বা ভারতে থাকতো না।

(৩) খাওয়া ভাল, যদি খেয়ে হজম করতে পার। তবে খালি খালি না খেয়ে, ওতে একটু মাখন, গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু লেবুর রস ও নুন দিয়ে খাবে ; তাতে হজম হবে তাড়াতাড়ি।

(৪) না—রোজ নয়—আপাততঃ পাঁচ দিনের বেশী নয়।

(৫) তেমন কোন যুক্তি নেই—তবে আসনে কাজ করে বিশ্বাস করি। তবে সেও একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত।

ধীরাজকুমার ঘাঁই (আসানসোল)। প্রঃ—আপনি কোন্ সালে বিশ্বশ্রী আখ্যা পেয়েছেন ? তখন দেহের কোন স্থানের মাপ কত ছিল আর গ্রুপ ভাগ হয় বয়স দিয়ে না উচ্চতা অনুযায়ী ? এ্যামেচার আর প্রফেসনাল একসঙ্গে শেষ হল কবে ?

উঃ—১৯৫১ সালে। ঐ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ীই মাপ আমার ছিল। এখনও আছে। গ্রুপ বয়স অনুযায়ী হয় না, উচ্চতা অনুযায়ী হয়। 5′—6″—class III ; 5′—9″—class II এবং above 5′—9″—class I. আমি 5′—6″ উচ্চতায় ছিলাম। ঐ ১৯৫১ সালেই এ্যামেচার এবং প্রফেসনাল এক সঙ্গে হয়েছিল—তার পরের বছর থেকে আলাদা ভাবে হচ্ছে।

তপনকুমার চৌধুরী (কোচবিহার)। প্রঃ—শরীর ভাল করতে কোন্ কোন্ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ? ব্যায়াম করে শরীর ভাল করতে কতদিন লাগে ? বয়স আমার ১৮, কিন্তু উচ্চতা মোটে ৪ ফুট ২ ইঞ্চি। বলুন জীবনে আমি করবো কি ?

উঃ—খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম-আনন্দ এবং নিয়মিত ও পরিমাণমত ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করতে গেলে কেলেঙ্কারী। ওটা করো না। তাড়াতাড়ি ভাল হওয়া আর না হওয়াটা নির্ভর করে শরীরের গঠনের ওপর।

সত্যিই ভীষণ বেটে তুমি। যোগাসন অভ্যাস করো। শশঙ্গাসন, ধনুরাসন, অর্ধমৎসেন্দ্রাসন, প্রতিটি চারবার করে করবে। প্রতিবার ৪০ সেকেণ্ড সাধারণ ভাবে দম নেওয়া ছাড়া করবে এবং তারপর শুয়ে শবাসনে ৩০ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিবে। সম্ভব হলে সকালে-বিকেলে দু'বেলা অভ্যাস করতে পার আর সপ্তাহে ৬ দিন করবে। ৩ মাস অভ্যাস করার পর আমায় পত্র দেবে।

যাক খুব ভাল তোমার হাতের লেখা। তোমার অতি অপূর্ব হাতের লেখা আমায় মুগ্ধ করেছে। নিয়মিত আমায় পত্র দেবে—জবাব পাবে ভাই। ইতি

—তোমাদের মনতোষদা।

খেলাধুলা

॥ শ্রীঅমিতাভ ॥

সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি এতদিন নিবদ্ধ ছিল ইংলণ্ডের দিকে। সেখানে বসেছিল খেলার মেলা। একদিকে বিশ্বজয়ী ক্রিকেটদল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলা ইংলণ্ডের সঙ্গে; শেষ হল টেনিসের পুণ্যতীর্থ উইম্বলডেনে বিশ্বের সেরা টেনিস প্রতিযোগিতা। এরই মাঝে আবার অনুষ্ঠিত হল ক্যাসিয়াস ক্লে এবং হেনরী কুপারের বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ। ক্লে পরাজিত করলেন কুপারকে এবং পরবর্তী লড়াইয়ে আবার লণ্ডনে মিলিত হচ্ছেন ইংলণ্ডের আর এক মুষ্টিযোদ্ধা ব্রায়ান লণ্ডনের সঙ্গে। কিন্তু সব খেলার আসরকেই আকর্ষণে অতিক্রম করেছিল নিরেট সোনায় মোড়া জুলেস রিমেট কাপের সম্মানের জন্য ফুটবলের সেরা দেশগুলির ফুটবল যুদ্ধ। প্রতি চার বছর অন্তর এই বিশ্বকাপের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সুরু করা যাক উইম্বলডেন টেনিস প্রতিযোগিতা দিয়ে। সংবাদপত্রে তোমরা সকলেই দেখেছ যে এবার দুটি নতুন মুখ বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। পুরুষদের বিভাগে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সফল করেছেন উইম্বলডেন বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। স্পেনের এক অখ্যাত পরিবারের ছেলে একদিনের বলয়ে ম্যানুয়েল সান্তানা আজ বিশ্ব টেনিসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, আর নিজের দেশ স্পেনকে এনে দিয়েছেন উইম্বলডেনের মত অমূল্য পুরস্কার। শুধু মাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা এবং অটুট মনোবলের সাহায্যে সান্তানা তাঁর চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছেন।

মহিলা বিভাগে এবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন আমেরিকার বিলি জিন মফিট কিং। তিনি ফাইন্যালে ব্রেজিলের মারিয়া বুলোকে পরাজিত করেন। গত দু বছরের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন এবার তৃতীয়বার বিজয়ী হয়ে ফ্রেড পেরীর রেকর্ড স্পর্শ করবেন বলে আশা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আকস্মিকভাবে তিনি তাঁর স্বদেশবাসী অনামী তরুণ ডেভিডসনের কাছে পরাজিত হলেন, অবশ্য খেলার মাঝপথে হঠাৎ পিছলে পড়ে মাইকের রডের সঙ্গে আঘাত লাগার জন্য তাঁর হাড়ে চিড় ধরে যায় কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাব নিয়ে।

বিশ্বকাপের খেলাতেও সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী সব ব্যর্থ হয়ে

গেল। সকলেই ভেবেছিল যে ব্রেজিল এবারও জয়ী হয়ে কাপ হ্যাট্রিক করে চিরতরে সোনায় মোড়া বিশ্বকাপ লাভ করবে। এবার আরও দুটি দেশের কাপ চিরতরে লাভের সম্ভাবনা ছিল, কারণ ইতিপূর্বে তারা দুবার বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিল। দেশ দুটি হল ইতালী এবং উরুগুয়ে। কিন্তু এই তিনটি দেশের কোনটিই বেশীদূর অগ্রসর হতে পারল না। তবে এবারের বিশ্বকাপের আসরে সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে উত্তর কোরিয়া দল। সর্বপ্রথম এশিয়া থেকে বিশ্বকাপে যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করল উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া দল যখন ইংলণ্ডে উপস্থিত হল, তখন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা তাদের আমলই দেয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রুপ থেকে জয়ী হয়ে তারা পৌছাল কোয়ার্টার ফাইন্যালে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে একেবারে পর্তুগালের সম্মুখীন। সকলেই জানে কোরিয়ার পরাজয় নিশ্চিত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও উত্তর কোরিয়ার খর্বকায় খেলোয়াড়রা প্রমাণ করল যে দু বছর তাদের কঠোর সাধনা ব্যর্থ হয় নি। আর তারা উপেক্ষার পাত্রও নয়। এবার বিশ্বকাপের আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছিল আর্জেণ্টাইনা দল, তাদের মারাত্মক খেলার জন্য! ব্রেজিল বুলগেরিয়ার সঙ্গে খেলার পর শক্তিহীন হয়ে পড়ল। কারণ পেলে, গারিনচা সহ প্রায় ছজন খেলোয়াড় হল আহত। পর্তুগালের ইউসেবিও বলতে গেলে এবারের আসরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। কোরিয়ার বিপক্ষে প্রথম চব্বিশ মিনিটের মধ্যেই পর্তুগাল তিন গোলে হারছিল, কিন্তু ইউসেবিওর অবিশ্বাস্য খেলা পর্তুগালকে জয়ী করল ৫—৩ গোলে। ইউসেবিও একাই দিলেন চারটে গোল। সেমিফাইন্যালে পর্তুগাল পরাজিত হল ২—১ গোলে ইংলণ্ডের কাছে। পরাজয়ের পর দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ইউসেবিও এবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা। অন্যদিকে রাশিয়াকে পরাজিত করে পশ্চিম জার্মানী উঠল ফাইন্যালে। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম জার্মানী বিশ্বকাপ জয় করেছিল সুইজারল্যাণ্ডে। ইংলণ্ড পশ্চিম জার্মানীর খেলায় নির্ধারিত সময়ে ফলাফল ২—২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে অতিরিক্ত সময় খেলান হয় এবং এই অতিরিক্ত সময়ে হার্স্ট একাই দুটি গোল দিয়ে ইংলণ্ডকে প্রথম কাপ বিজয়ী হতে সাহায্য করলেন। ফাইন্যালে ফলাফল হল ৪—২ গোল এবং হার্স্ট করলেন একাই তিনটি গোল।

এদিকে কলকাতার মাঠে ফুটবল লীগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের চ্যারিটি খেলায় সমাজপতির দেওয়া একমাত্র বিজয়সূচক গোলে মোহনবাগান পরাজিত হল। ইস্টবেঙ্গল এইদিন ভাল খেলে জয়ী হয়েছে। এই খেলায় পরাজিত হবার ফলে মোহনবাগানের লীগ জয়ের সম্ভাবনা বলতে গেলে প্রায় অন্তর্হিত হল। পয়েণ্টের হিসাব-নিকাশের অবকাশ আর এখানে নেই বলে করতে পারলাম না, আর সংবাদপত্রে পয়েণ্টের টাটকা খবর তো তোমরা পাচ্ছই।

নতুন ধাঁধা

১। নয় থেকে এক গেলে আটই তো হয়;
কিন্তু ভাই দশও হয় আজগুবি নয়।

শঙ্করকুমার রাণা
(গ্রাঃ নং ১৩৭২৬)

২। নয়নে দুটি দেখিতে পাও,
দেখ না কিন্তু শ্রবণে;
বনের প্রান্তে বসতি করে,
পাবে না দেখা ভ্রমণে।
কাননে তারে দেখিতে পাবে
দুইজনে সেথা,
কে আছ এমন, পার যে রতন
খুঁজিয়া আনিতে হেথা।

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়
(গ্রাঃ নং ১৯১৫৯)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মণ্ডুক ব্যাঙ ও ভেক এক জেনো ভাই,
মানব নর ও লোক এ তিনেও তাই।
এক অর্থ হয় নারী রমণী ললনা,
পাখী দ্বিজ বিহঙ্গম আলাদা বোলো না।
একই জানবে ঊর্মি তরঙ্গ ও ঢেউ,
পাড় তীর কূল এক জান নাকি কেউ?
এক জন্তু শাখামৃগ কপি ও বানর,
এক জিনিসই বস্ত্র বসন কাপড়।

তিন এক জেনো নেত্র নয়ন লোচন,
বিভিন্ন নহেক যুদ্ধ সমর ও রণ।
ভিন্ন নয় কভু চুল চিকুর ও কেশ,
তিন এক উৎকৃষ্ট উত্তম ও বেশ।
এক হয় বিভাবরী রজনী যামিনী,
এক জেনো জলধর মেঘ কাদম্বিনী।
অবোধ নির্বোধ মূর্খ সম তিন এই,
ধার কর্জ আর ঋণ কোন ভেদ নেই।

এক ফল জেনো রম্ভা কদলী ও কলা,
সম অর্থ জেনো গ্রীবা কণ্ঠ আর গলা।

উত্তরদাতাদের নাম

শুভা দাশগুপ্ত (১৮৫০২); পান্নালাল লাহা (চেঙ্গাইল); অশ্বিনীকুমার ঘোষ (১৯২৪৬); শিখা দত্ত (২০৮৪৫); তাপস ঘোষ (১৪২৭৪); মহম্মদ শফি (বীরভূম); সুব্রত, শান্তনু, শৈবাল ও কালিদাস বসু (কলিকাতা); কেয়া বসু (১৮৭৫৭) কলিকাতা; স্বপ্না ও শিপ্রা দত্ত (২০৩৬৮); কুমারী মঞ্জুরাণী দে (১৮৭৬৪); বিশ্বনাথ দত্ত, কে. বদরুদ্দিন (বীরভূম); রমণীমোহন (হেতমপুর)।

সম্পাদিকার চিঠি

ছোট বন্ধুরা,

এবারের চিঠি লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে, আগামী ১৫ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস এবং এক লোকোত্তর মহাপুরুষের জন্মদিন। এই শুভদিনে আমরা প্রণাম জানাই—পরাধীন ভারতের পূজ্য লোকনেতা শ্রীঅরবিন্দকে। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের এক বিশিষ্ট প্রেরণা।

এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী ভারতবাসীর জানা দরকার। তাঁর জীবনের দু'একটি ঘটনার কথা তোমাদের বলি।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ পদের সম্মান ও অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে কলকাতায় এসে 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। যুগান্তরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে তিনি আহ্বান জানালেন দেশের যুবশক্তিকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে হবে। ইংরাজ সরকার অবিলম্বে যুগান্তর পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করলেন ইংরাজ সরকার। অপরাধ—রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ রচনা। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল অগ্নিযুগের বিশিষ্ট নেতা ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত "নমস্কার" কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লোকনেতা শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই বলে—

"হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। * * *
* * * * * *
* * * * বিধাতার

শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন ?”

আমাদের স্বাধীনতা পাবার পর সুদীর্ঘ উনিশ বছর কেটে গেছে। কবিগুরু একদিন যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর কি ভারতবাসী পেয়েছে ?

হতাশা, অভাব, আশঙ্কা, আর সমস্যাই আজ প্রবল হয়ে উঠেছে। তবুও স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র সঙ্কল্প মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রাণের মূল্যে অর্জন করা এই স্বাধীনতার গরিমা ও পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে হবে ভারতবাসীকেই।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ করি। তোমরা আমার প্রীতি ও শুভকামনা জেনো।

শুভার্থিনী
তোমাদের সম্পাদিকা

সম্পাদিকা—**শ্রীমতী দাশগুপ্ত**
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের ‘এনামেল’ হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝক্‌ঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাঁসি।

সাধনা দশন

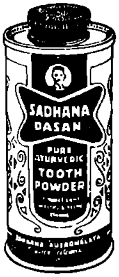
SADHANA
DASAN
PURE
AYURVEDIC
TOOTH
POWDER

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

Registered No. C. 1104
ভাদ্র—১৩৭৩

আমাদের জাতীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা

আর

পূজার আনন্দকে পরিপূর্ণ করে

বার্ষিক শিশুসাথী

শিশু ও কিশোরদের উপযোগী এবং কল্যাণকর অজস্র রচনা
আর পাতায় পাতায় চমৎকার সব ছবি
এক নিমেষেই তোমাদের মন কেড়ে নেবে।

এই অনুপম সঙ্কলনটি পরম সমারোহে মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।

মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ বছরও নির্দিষ্ট সংখ্যক বই ছাপা হচ্ছে। মনিঅর্ডারে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক-গ্রাহিকারা নাম রেজেস্ট্রি করে নাও। যথাসময়ে ডাকযোগে বার্ষিক সংখ্যা পাবে।

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২